সুপ্রাচীন কাল হতেই ভারতের নারীরা ছিলেন স্বমহিমায় উদ্ভাসিতা। বৈদিক যুগে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক হিসাবেই সম-অধিকারে বিরাজ করতেন। এই প্রথার অবনমন শুরু হয় সম্ভবত মধ্যযুগের কিঞ্চিৎ পূর্বে, একে একে ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে নারীর সমস্ত স্বাধীনতাই ছিনিয়ে নেওয়া হয়। বর্তমান যুগে নারীরা তাঁদের সেই লুণ্ঠিত অধিকার পুনর্গ্রহণের প্রচেষ্টায় সচেষ্ট। এই শক্তির বিকাশ জগতে আনুক সাম্য...

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

গুঞ্জন

মাসিক ই-পত্রিকা

বর্ষ ২, সংখ্যা ১০

মার্চ ২০২১

নারী সংখ্যা

কলম হাতে

ডঃ মালা মুখার্জী, ডাঃ অমিত চৌধুরী, সুভাষ মুখার্জী, অরুন্ধতী চক্রবর্তী, সুজন ভট্টাচার্য, প্রণব বসু, রিয়া মিত্র, নন্দিতা চৌধুরী, হাজেরা বেগম, সুমন চক্রবর্তী এবং পাণ্ডুলিপির অন্যান্য সদস্যরা...

প্রকাশনা

পাণ্ডুলিপি (গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর)

বি.দ্র.: লিটল ম্যাগাজিন হিসাবে মুদ্রিত এই পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ হয় ইং ১৯৭৭ সালে...

যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পায়ে পায়ে

গত মাসে আমাদের গোষ্ঠীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল লেখক-লেখিকাদের এবং সহৃদয় পাঠককুলকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বলা হয়েছিল অনুষ্ঠানের পর একটি বিশেষ চমক থাকবে, সেটি ছিল প্রিয় লেখক-লেখিকাদের জন্য 'বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী' নামে পান্ডুলিপির পক্ষ থেকে একটি ই-গ্রন্থ। ইতিমধ্যেই এই ই-গ্রন্থটি দেশে-বিদেশে বহুল সাড়া ফেলেছে। বলা যায়, এই বাংলা ভাষাকে আপন করে সকল স্রষ্টাদের সৃষ্টি সত্যি-ই অমূল্য ও অতুলনীয়। আশা রাখি, আগামী দিনেও 'পাণ্ডুলিপি' ও তার 'গুঞ্জন' পত্রিকা সকল শুভাকাঙ্খীর ভালবাসায় ও সহযোগিতায় হয়ে উঠবে সাহিত্য ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। আমাদের তরফ থেকে থাকবে বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নতুন নতুন পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়নের সঙ্কল্প।

বাংলা সাহিত্যে নারীকে বহুন্তর ও বহুমাত্রিক দৃষ্টিতে দেখা হয়। বিবিধ স্রষ্টার হাতে নারী চরিত্রের এক অভিনব দিক পরিস্ফুটিত হয়। নারী কখনও স্নেহময়ী ও প্রেমময়ী, কখনো বা রহস্যময়ী কিংবা প্রতিবাদী। 'গুঞ্জন' পত্রিকার মার্চ সংখ্যাটি তাই নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিককে কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধে সাজিয়ে উপস্থাপিত করা হল। আশা করি সবার ভালো লাগবে। ■

বিনীতা — রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

কলম হাতে

প্রচ্ছদ চিত্রঃ Photo by Joy Deb from Pexels

কলম হাতে

আমাদের যোগাযোগের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

পাঠকের দরবার

নন্দিতা চৌধুরী
সাহিত্যিক

জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যার পাঠ প্রতিক্রিয়া

গুঞ্জনের জানুয়ারি সংখ্যা পড়া হল— নিঃসন্দেহে প্রতিটি লেখারই একটি নিজস্ব মান রয়েছে। কিছু লেখা বিশেষ উপাদেয়।

সম্পাদিকা রাজশ্রী দত্তের সম্পাদকীয় বার্তাটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক, মনোগ্রাহী। তাঁর ‘পায়ে পায়ে’ লেখাটিও খুব সাবলীল। ‘চার ঋতু-অধ্যায়’ পূর্ব সংখ্যাগুলো আমার পড়া হয়ে ওঠেনি, পড়ব অবশ্যই।

ঋত্বিকা চ্যাটার্জি, রুদ্র দাস ও রূপসা পালের আঁকা প্রত্যেক ছবিই প্রশংসার দাবী রাখে।

কবিতায় আবদুল বাতেনের ‘শুভ নববর্ষ’, জয়তী গাঙ্গুলীর ‘বিশ্বাস’, সন্দীপ বাগের ‘লেটস হোপ’ সংহিতা ভট্টাচার্যর ‘সম্পর্ক’, শুভা লাহিড়ীর ‘রাত্রি এলে’, ফাল্গুনী গিরি মণ্ডলের ‘আমলকী পথে’, সোমনাথ চৌধুরীর ‘ভাবাবেগ’, সমীর দাসের ‘২০২১’ (বর্ষবরন), সিদ্ধার্থ বসুর ‘বন্ধুত্ব’ — সব ক'টি কবিতা নিজস্ব ধারায় সমৃদ্ধ ও খুবই মনোমুগ্ধকর।

দেবাশিস চক্রবর্তীর ‘বিকল্প মিডিয়া’ অত্যন্ত জ্ঞানবর্দ্ধক ও তথ্য সম্বলিত একটা লেখা।

ডাঃ অমিত চৌধুরীর ‘শিব দুহিতা নর্মদা’র চতুর্থ পর্বের অপেক্ষায়।

বিশ্বপ্রসূন চ্যাটার্জির ‘যেতে নাহি দিব’ এক বাস্তব চিত্র

খুবই ভালো লাগল।

দীপঙ্কর সরকারের ‘শিকড়’এর সপ্তম পর্বের অপেক্ষায় আছি। এত সুন্দর ঘটনা ও দৃশ্য বর্ণনা, খুবই উপভোগ্য।

নবীন চৌধুরীর ‘বুড়ো বয়সে হাতে খড়ি’তে গল্প লেখার স্মৃতিটি সত্যিই সকলের সাথে ভাগ করে নেবারই মতো।

খেলার ইতিহাস জানা নেই, কিন্তু সুজন ভট্টাচার্য-র ‘মেলবোর্নের পর সিডনিও কি দেখবে ভারতীয় রূপকথা’য় তথ্য সম্বলিত বর্ণনা পড়তে আগ্রহ জাগালো।

প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর ‘মাথা বদল’ খুবই রোমাঞ্চ সমৃদ্ধ তথ্যাবলীর সংকলন, দারুণ লাগল।

প্রণব কুমার বসু আমার একজন প্রিয় লেখক, কবি ও বেশিটাই ছড়াকার। কী অবলীলায় কৌতুকরসে ভরা ছোটগল্প ‘গরমিল’কে পরিবেশন করলেন। প্রণব বসুর ‘আগমন’ ছোট্ট হয়েও প্রচণ্ড খুশীর আগমনী গল্প।

রাজশ্রী দত্তের আলোক চিত্র ‘ডুমুরজলার ভোর’ ও ‘অনুকরণ।’ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ‘মিশ্র ভারত’ সুপার শট। ছড়া রচনায় ও চিত্রাঙ্কনে যথাক্রমে প্রশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় ও অনিশা দাস উভয়েই নিজস্ব দক্ষতার নিদর্শন রেখেছেন।

আমার আর এক বিশেষ প্রিয় লেখক পিনাকী রঞ্জন বিশ্বাস। যখন তিনি ভ্রমণ কাহিনী লেখেন, অসামান্য লাগে। তাঁর কাহিনীতে পরিবেশ, পরিস্থিতি, চরিত্র ও ঘটনার নিখুঁত বিশ্লেষণ থাকে। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে এক মাদকতা,

নেশার মতো ঘোরে, পাতার পর পাতায় ছুটে চলায়। যথাযথ বর্ণনার কী অপরিসীম ক্ষমতা!

ডঃ মালা মুখার্জির ‘তারা খসা রাত’ অভিনব মানবিকতার নিদর্শন। অবিবাহিতা পাগলিনী প্রিয়তমার দায়িত্ব পালনের অভূতপূর্ব উদাহরণ, খুব ভালো লাগল।

অনিমেষ বৈশ্য-র ‘আজাইরা প্যাচাল’এ যেন সকলেরই মনের কথা। একটি মনলোভা লেখন।

সুন্দর উপস্থাপনা বিজয় নারায়ণ চৌধুরীর ‘ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কয়েকটি জানা অজানা কথা’ একটি তথ্য সমন্বিত এবং কৌতূহলী, শিক্ষণীয় ও উপকারী লেখন।

মধুমিতা গণের ‘সুলতানা’ নিঃসন্দেহে সাধারণের মনে দাগ কাটার মতোই একটি গাঁথা।

আমি বোধ হয় কারুর নামের আগেই শ্রী, শ্রীমতি, শ্রীযুক্ত অথবা কবি ইত্যাদি লিখিনি। কোন অসুবিধে নেই তো? ■

সবিনয় নিবেদন

‘গুঞ্জন’ কেমন লাগছে তা অবশ্যই আমাদের জানাবেন। আর আপনার লেখা গুঞ্জনে দেখতে হলে, আপনার সবচেয়ে সেরা (আপনার বিচার অনুযায়ী) এবং অপ্রকাশিত লেখাটি আমাদের ‘ই-মেল’ (contactpandulipi@gmail.com)-এ পাঠিয়ে দিন (MS Words + PDF দু’টি ফরম্যাটই চাই)। সঙ্গে আপনার একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবিও অবশ্যই থাকা চাই – সাইজঃ ৩৫ mm (চওড়া) X ৪৫ mm (উচ্চতা); রিসল্যুশনঃ 300 DPI হওয়া চাই। আর Facebook এর ‘পাণ্ডুলিপি গল্প, কবিতা, গান, গদ্য ও নাটকের আসর’ গোষ্ঠীতে অবশ্যই আপনার নিয়মিত উপস্থিতি ও যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়। তবে লেখা অনুমোদনের ব্যাপারে বিচারক মণ্ডলীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

বি.দ্র.: মে সংখ্যার লেখা পাঠানোর শেষ তারিখঃ ১৫ ই এপ্রিল, ২০২১

'বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী' ই-গ্রন্থের পাঠ প্রতিক্রিয়া

'পাণ্ডুলিপি'র অবিস্মরণীয় চমক 'বাংলা ভাষা ও বাংলা ভাষী' পড়ে আমি অভিভূত হলাম। এই সময়ে একটি পত্রিকা নিয়মিত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সাথে সময়োপযোগী বিশেষ ই-গ্রন্থ, যেভাবে আপনারা করছেন, তা খুব আনন্দ দেয় মনে।

প্রথমেই বাসন্তী পাতাগুলো মনে বসন্ত এনে দিল। এই বিশেষ ই-গ্রন্থটি স্বর্গীয় শ্রী অসিত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে উৎসর্গ করা — নিঃসন্দেহে এক মহৎ শ্রদ্ধার্ঘ্য, ধন্য পাণ্ডুলিপি।

কামারপুকুরের দোতলা বাড়ীর ছবিটি স্মৃতির দরজা খুলে দিয়ে সে কোন কালে নিয়ে গেল।

প্রত্যেকটি কবিতা সুন্দর, বাংলা মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও প্রতিশ্রুতিতে পরিপূর্ণ।

প্রবন্ধগুলিও তথ্য সমৃদ্ধ। বর্ষার ইতিকথা পড়ে বর্ষার আগমনের প্রতীক্ষায় রইলাম, কেননা এ বসন্তে যা গরম পড়েছে।

ফুটবল, হকির ওপর লেখাগুলো বাংলার আরেকটি রূপ তুলে ধরেছে, নিঃসন্দেহে নতুনত্ব।

বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর সত্যি দরকার। লেখাটি তথ্য

সমৃদ্ধ, খুব ভাবায়। অথচ বাংলা ভাষা দিকে দিকে স্বীকৃতি পাচ্ছে, সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াতেও স্বীকৃত। আফ্রিকায় স্বীকৃতি প্রাপ্তির খবরটি অজানা ছিল।

অণু-চিন্তন নাম হলেও লেখাগুলো পরমাণু শক্তির থেকেও অধিক শক্তিশালী।

আমার সোনার বাংলা গল্পটি খুব ভাল লাগল। সব মিলে সুন্দর একটি উপস্থাপনা। 'পাণ্ডুলিপি' দীর্ঘজীবী হোক।

শেষে, আমার কবিতা প্রকাশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কোনদিন ভাবিনি আমার লেখাও কোথাও ছাপা হতে পারে। খুব ভাল লাগল এই স্বপ্নপূরণে। সুন্দর এই সৃষ্টি বেশ কিছু জায়গায় বিতরণ করলাম, তাদের মন্তব্যও পাব আশা করি। ■

লেখকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ

১) 'গুঞ্জন' এর জন্য আপনার লেখা (MS Words এবং PDF) আমাদের ই-মেল এ পাঠান। সাথে ফটো থাকা চাই।
আমাদের E-mail: contactpandulipi@gmail.com
২) বানান ও যতি চিহ্নের যথাযথ প্রয়োগ প্রত্যাশিত।
৩) পাণ্ডুলিপি ভিন্ন অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখা 'গুঞ্জন' এর জন্য পাঠাবেন না।
৪) দয়া করে সম্পূর্ণ পত্রিকাটা শেয়ার করুন।

গুঞ্জন পড়ুন ~ গুঞ্জন পড়ান

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সম্প্রতি আমাদের 'গুঞ্জন'-এর প্রিয় কবি ডাঃ অরুণ ভট্টাচার্য (অরু ভট্ট) মহাশয়ের অমৃতলোকে যাত্রার সংবাদটি পেয়ে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। ভাবতেই অবাক লাগে ৯০ বছরের অধিক জীবন কালাবধি একইভাবে চলেছিল ওনার ক্ষুরধার কলমের গতি।
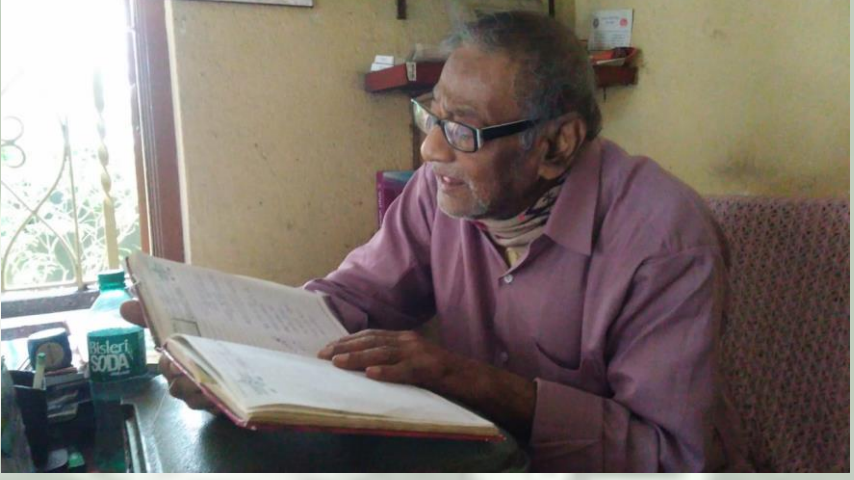
৺শ্রী অরু ভট্ট, কবি

পেশায় চিকিৎসক হলেও, সাহিত্যের নেশাই ছিল ওনার জীবন সঙ্গী। উনি ছিলেন শরৎ সাহিত্যের একনিষ্ঠ অনুরাগী। উনি বলতেন, সমাজ জীবনকে অনুধাবন করতে হলে শরৎ সাহিত্য পড়া অতিশয় আবশ্যক।

সাহিত্য জগতে উনি নিজের নামটি প্রকাশ করতে সর্বদাই অনাগ্রহী ছিলেন। তাই ওনার সমস্ত লেখাতেই 'অরু ভট্ট' ছদ্মনামটি ব্যবহার করতেন। বাংলা সাহিত্যে ওনার অবদান চিরদিন ঐ নামেই সমুজ্জ্বল হয়ে রইবে।

ইশ্বরের কাছে আদরণীয় কবি 'অরু ভট্ট'র অমর আত্মার

শ্রদ্ধাঞ্জলি

অসীম শান্তি প্রার্থনা করে, ‘গুঞ্জন’ পত্রিকায় প্রকাশিত ওনার একটি কবিতা শ্রদ্ধাঞ্জলী-স্বরূপ পাঠককুলের কাছে আজ নিবেদন করছি।

জননী

অরু ভট্ট

হিংস্র নখরাঘাতে নিজেকে রক্তাক্ত করি,
তিলে তিলে পুড়িয়েছ
কামের আগুনে বারবার।
সুগন্ধ পাপড়ি ঝরিয়েছ নিজেরে ধবংস করি-
শুধু একটি ফলের আশায়।
তুমি নারী, তুমি জননী।
উত্তরিতে লগ্নান্তর, কত ব্যথা, কত অশ্রু
নীরব, নিভৃতে গিয়াছ কেঁদে।
তিলে তিলে, পলে পলে
রক্ত, মেদ, মজ্জায়- মনের মাধুরী মিশায়ে
গড়েছ মানস পুতুলী-
দশমাস দশদিন ধরিয়া।
সঞ্চিত করিয়াছ অমৃত শুধা, অনাগতের তরে-
নিঙাড়িয়া জীবনরস
সলজ্জ গোপনে
তুমি ধাত্রী, তুমি জননী। ■

প্রণতঃ প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.), নির্বাহী সম্পাদক, গুঞ্জন ও রাজশ্রী দত্ত, সম্পাদিকা, গুঞ্জন

অরণ্য

অশোক সামন্ত

পাতা ঝরা অরণ্যে
বারুদের গন্ধ,
পুড়ে যায় সব
কিছু হাহুতাশ বন্ধ।

কে জানে বা কেউ কেউ
উড়ন্ত তুবড়ি।
সেই আঁচে ছারখার
পুড়ে যায় ঝুপড়ি।

পলাশের লাল রঙ
নেড়া পোড়া গাছটায়।
ঝলসে কালশিটে
হলুদের পিঠটায়।

আগুনের হলকায়।
চোখজোড়া অন্ধ
হাসি নয় কান্নায়
ভয় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব।

প্রকৃতি

মানুষে মানুষ খায়
পশুরও অধম
দিনের শপথগুলো
রাতেতে হজম।

চারিদিক নিশ্চুপ
খুরোধার দৃষ্টি
হাহাকার বন্য নর
কবে হবে বৃষ্টি।

অশান্ত কলোরবে
পশুপাল চঞ্চল।
অরণ্যের বুক চিরে
কে বা কার নিশ্চল।

যাদেরই এমন কাজ
মানুষের বায়না।
অরণ্যের দিবারাত
চরণের আয়না। ■

নমামি দেবী নর্মদে

শিব দুহিতা নর্মদা

ডাঃ অমিত চৌধুরী

চতুর্থ পর্যায় (১)

লক্ষ্মী পূজোর পরেই ২১ অক্টোবর বোম্বে মেলে চেপে বসলাম আমরা তিন জন। কাকাজী, অশোক দাসজী এবং আমি। ২২ অক্টোবর সন্ধ্যে সাতটায় করোলি ষ্টেশানে পৌছালাম। একটা অটো ভাড়া করে চলে এলাম ষোলো কিলোমিটার দূরে ব্রাহ্মণ কুর্দ ঘাটে, গতবার যেখানে পরিক্রমা শেষ করে ছিলাম। প্রথমে কথা ছিল দু'দিন পর অর্থাৎ ২৪ অক্টোবর দিব্যানন্দজী আমাদের সাথে যোগ দেবেন। কিন্তু ওনার কাজ বাতিল হওয়ায় আমাদের আগেই সকালে চলে এসেছেন ব্রাহ্মণঘাটে মাতাজীর আশ্রমে। রাত ৯টার সময় পৌছে হাত মুখ ধুয়ে গরম খিচুরী পেয়ে গেলাম দিব্যানন্দজীর সৌজন্যে। এখানে সন্ধ্যের পরেই ঠান্ডা পড়ে। আজও ঠান্ডা আছে।

নর্মদাকে ডান দিকে রেখে হেঁটে চলেছি। নদীর পাড় ধরে চলা খুবই কষ্টকর সেটা প্রতি মুহূর্তেই বুঝতে পারছি। আজ ২৩ অক্টোবর খুব ভোরেই আমরা বেরিয়ে পড়েছি। যদি কিছুটা এগিয়ে যাওয়া যায় সেই লক্ষ্যে। দুপুরে এখানে কিন্তু বেশ গরম পড়ে। ব্রাহ্মণ ঘাট থেকে রামঘাট, রামঘাট থেকে হাণ্ডিয়া ঘাটে এলাম। কোন বিশ্রামের জায়গা নেই,

নমামি দেবী নর্মদে

নদীর চড় দিয়ে এগিয়ে চলেছি 'নর্মদে হর' জপ করতে করতে। একটু জল খাওয়ার দরকার। নদীর জলই ভরসা। আমার কাছে জল নেই। ভীষণ চড়াই-উৎড়াই দিয়ে আজকের যাত্রা পথ। নদীর জল খেলাম। না খেয়েও উপায় ছিল না। দুপুর একটা নাগাদ লিঙ্গঘাটে পৌছালাম।

খুব বড় নর্মদার আশ্রম। সেখানে মহারাজ সদাবর্ত ছিলেন। তিনটের সময় ভীষণ সূর্যের তাপ তারই মধ্যে বেড়িয়ে পড়েছি। সন্ধ্যের আগে কোথায় যাব জানিনা। সেই নদীর পাড় ধরেই হাঁটা। "নর্মদা কী হর কঙ্কর শঙ্কর হোতা হে" শাস্ত্রে আছে শিবের বাৎসল্য রসের লীলা এই নর্মদা ভূমি। শিব কন্যা নর্মদা। আবার শিবের মাও নর্মদা। তাই নর্মদার গর্ভে সমস্ত 'কঙ্কর হি শঙ্কর।' নর্মদার বালিতে প্রচুর শিবলিঙ্গ পড়ে রয়েছে দেখলাম। কত আর কুড়াবো, যতই কুড়াই আরো নিতে ইচ্ছা করে। দিব্যানন্দজীর কথায় ঘোর কাটলো। আর নেবেন না ডাঃ বাবু, ব্যাগ ভারী হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি। তাই আর নেওয়া বন্ধ করলাম।

খাগরোলা ঘাটে এলাম। নদীর চড় থেকেই সিঁড়ি উঠে গেছে। অনেক উঁচুতে পাড়। এলাম এক রামানুজ সম্প্রদায়ের সাধুর আশ্রমে। আজ এখানেই রাত্রিবাস। সাধুটির বাঙালী সম্পর্কে ধারণা খুব একটা ভালো নয়। তারপর আমরা জুতো পরে পরিক্রমা করছি, খন্ড পরিক্রমা করছি ইত্যাদি। যদিও উনি একবারও পরিক্রমা করেননি। এর মধ্যে ৩০-৩২ বছর বয়সের নকুল দাসজী নামে একটি

ছেলে এসে হাজির। সেও পরিক্রমা করছে, রাতে এখানে থাকবে। তার সাথে মহারাজ যোগ দিয়ে আমাদের খুব অসম্মান করতে লাগলেন। ছেলেটি যদিও জুতো পরে, রেডিওতে গান শুনতে শুনতে পরিক্রমা করছে। দিব্যানন্দজী আমাদের হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ওদের সাথে কথা বললো। কিন্তু তাতে আর কি হয়! নর্মদার ঘাটে এত ভেদভাব দেখে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল...

" গঙ্গা সিন্ধু নর্মদা
কাবেরী যমুনা ঐ
বহিয়া চলেছে আগের মতো
কইরে আগের মানুষ কই !"

নর্মদে হর। ...ক্রমশ ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ সরস্বতী...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১১ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

টুকরো স্মৃতি

বুড়ো বয়সে হাতে খড়ি

নবীন চৌধুরী

(৪)

হঠাৎ সাইকেলের বেলের ঘন্টা ভেসে এল। পেছনে তাকিয়ে দেখি অর্নববাবু ঘেমে নেয়ে সাইকেলটি ফুল বাগানের বেড়ায় স্ট্যান্ড করিয়ে ভেতরে ঢুকছেন। ওনাকে দেখে রামেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়েছে। সাথে সাথে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। অর্নববাবু নিজের চেয়ারের কাছে এসে, আঙুলের ইশারায় আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলাম। এবারে রামেশ্বরকে বললেন, "তোমার কি আছে?"

— স্যার, প্রেস থেকে কবিতার প্রুফটা নিয়া আইছি, আপনি যদি একটু কারেকশন কইর‍্যা দেন।

— ঠিক আছে কবিতাটি পড়ো।

ঝোলা থেকে প্রিন্টিং প্রুফটি বের করে রামেশ্বর কবিতা পড়া শেষ করল। এবারে ওর থেকে কাগজটি না নিয়েই প্রফেসর মশাই বলছেন, "ওখানে তিনটে বানান ভুল আছে।" বুক পকেট থেকে কলম বের করে কবিতাটি শুধরে দিয়ে রামেশ্বরকে চলে যেতে বললেন।

রামেশ্বর বিদায় নেবার সাথে সাথে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কি আছে?" আমি ততক্ষণে আমার

টুকরো স্মৃতি

অসাধারণ লেখাটি দু'হাতে করে জড়িয়ে ধরেছি। আমি বুঝে গেছি, আমি এসে পড়েছি সেই উট পাহাড়ের নীচে, যেখানে আমার সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষাৎ 'জব্বর সেন।' তাই একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, "আমাকে আর আপনি করে বলতে হবে না, তুমি করে বললেই চলবে।"

উনি বললেন, "ঠিক আছে, খাতাটা দাও।" আমি বললাম, "আমি পড়ি, আপনি শুনুন।" আবার বললেন খাতাটা দাও। আমি আবারও বললাম, "আমি পড়ি আপনি শুনুন।" এবারে প্রায় ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, "খাতাটা দাও বলছি।" মনে হল আমি যেন পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছি, সেরকমই একখানা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, এখন আমার করণীয় কি আছে! লাগামহীন হাজার পাউন্ডের প্রেশারে পা হড়কে খাতাটি ওনার হাতে তুলে দিলাম। এই সামান্য বিশেষ শব্দের কল্যাণে পুতুল ম্যাডাম ভেতর থেকে চুপটি করে ওনার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। যা এখানে সাধারণত কখনো হয় না।

প্রফেসর মশাই দাঁড়ানো অবস্থায় খাতা থেকে রাবার ব্যান্ডটি সরিয়ে মলাট খুলে প্রথম পাতাটি পড়বার অনেক চেষ্টা করলেন, তারপর খাতাটি বন্ধ করে মলাটের ওপর লেখা গল্পের নামটি পড়ে আমায় জিজ্ঞেস

করলেন, “গল্পের নামটি কি?”

আমি কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বললাম, “যতো ধাধা মনজদি।”

উনি সঙ্গে সঙ্গে খাতাটি টেবিলে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, ‘যত ধাঁধাঁ মঞ্জুদি,’ যতো-তে ও-কার হবে না, ধাঁধাঁ-র চন্দ্র বিন্দু দুটি নেই, মঞ্জুদির রসু-উ- কার নেই সঙ্গে ন-এর জায়গায় ঞ বসবে, তিনটি শব্দের মধ্যে চারটে ভুল। এটা কি পড়বো!

এবারে পুতুল ম্যাডাম এসব কান্ডকারখানা দেখে বলছেন, “কি হয়েছে গো, কি হয়েছে?” প্রফেসর আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন, “ভদ্রলোক সাতদিন ধরে আমাকে ওঁর লেখাটি দেখাবেন বলে ঘুরঘুর করছেন – আর দেখো আমি এমন হাতের লেখা এই জীবনে দেখিনি, তারপর দাঁড়ি নেই, কমা নেই... এমনকি প্যারাগ্রাফ দিতে পর্যন্ত শেখেননি। সত্যি কথা বলতে কি, এই ভদ্রলোককে আবার নতুন করে এই বয়সে ‘হাতে খড়ি’ দেওয়া উচিত।

কি কাণ্ড রে বাবা! এই প্রফেসর লোকটা বলছে আমাকে আবার হাতে খড়ি দেবে। যেখানে আমি একজন পলিটেকনিক পাশ ব্যক্তি, কন্ট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, লক্ষ কেন কোটি টাকার কারবারী, ভি আই পি সেজে গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা,

টুকরো স্মৃতি

অনেকগুলো ব্রিজের সাথে শহরের আসল ভাঙ্গাটুলটা আমার হাতে তৈরি, যেখানে শহর শুদ্ধ প্রায় সব লোক আমায় চেনে, আর এই মাস্টারমশাই বলেন কি না আমাকে নতুন করে 'হাতে খড়ি' দেবেন! একবার ভাবুন, আমার মতো লোকের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আমার অন্যান্য সমস্ত কলিগ যাঁরা ক্লাস টু ফেল, থ্রি ফেল ইত্যাদি কিংবা এম এল এ, এম পি ও মন্ত্রীগুলো এই ডাকসাইটে দ্রোনাচার্যের পাল্লায় পড়লে অঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী নির্ঘাত পালিয়ে গিয়ে দিদির কোলে চড়বে...

যাকগে, প্রথম দর্শনেই আমার সরলতার কথা অনুধাবন করে পুতুল ম্যাডামের মুখটা কেমন যেন পাংশুটে হয়ে এল, ভাগ্যিস একটা সন্দেশ ও এক কাপ চা খাইয়ে ছিলেন, এই যা সান্ত্বনা পাচ্ছেন। এবারে আমার অবস্থা যে কেমন হয়েছে নিশ্চয়ই কারো বোঝার বাকি নেই। শরীরের সব রক্ত মাথায় চেপেছে। অনুভব করছি, কান দুটো রক্তের চাপে লাল হয়ে গেছে। চোখ ফেটে বন্যা বইতে চাইছে। সত্যি কথা, মান সম্মানের আর কিছু বাকি রইলো না, এক ধাক্কায় সব শেষ। একটু দম নেবার পরে ঠিক করে ফেলেছি, এই অপমানের সাক্ষী থাকা বেয়াদপ খাতাটি নিয়ে ঘর থেকে বের হতে পারলে সোজা ওটাকে গঙ্গার জলে

ছুঁড়ে ফেলব। এই মুখ ভুল করে আর কাউকে দেখাতে চাই না। সরি, নিজেকেও না।

মানসিক ভাবে চূড়ান্ত বিধ্বস্ত হওয়ার পরে মনে হচ্ছিল হায়! ভগবান, আমি কি খুনি ডাকাতের থেকেও বড়ো আসামী, যার জন্য আমায় এই শাস্তি দিচ্ছো। পা দু'টোতে যেন শক্তি নেই। চোখ তুলে তাকাতে পারছি না। নড়বড়ে হাত দুটো দিয়ে কোনক্রমে খাতাটি তুলে টলমল করতে করতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছি, যেই না দরজাটা পার হতে যাব, প্রফেসর হেঁকে উঠলেন এবং বললেন "ক'টায় এসেছ।" আমি কিছু বলবার আগেই পুতুল ম্যাডাম বলে উঠলেন "ঠিক বারোটায়।"

প্রফেসর নিজের হাতঘড়িটা একবার দেখলেন, তারপর নিজেই বললেন "দুটো বেজে পঁয়ত্রিশ। ঠিক আছে এতক্ষণ ধৈর্য ধরে যখন বসেই ছিলে তাহলে আপাতত একটি পাতা পড়ে যেতে পার।" লজ্জার মাথা খেয়ে আমি কারোর দিকে না তাকিয়ে আমার বেঞ্চে আবার ফিরে এসেছি। এবারে কোনওক্রমে গুছিয়ে প্রথম পাতাটি পড়লাম।

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "আরও কি পড়ব?" প্রফেসর আমায় বললেন "আরও দু'টি পাতা পড়ো" ততক্ষণে পুতুল ম্যাডাম বিদায় নিয়েছেন। আরও দু'টি পাতা পড়লাম। আবার জিজ্ঞেস করলাম, "আরও

পড়ব?” উনি আমায় বললেন, “আনটিল ফারদার অর্ডার।” পড়া শেষ, খাতা শেষ, গল্প শেষ। মাত্র খাতা বন্ধ করেছি। তখন উনি চেয়ার থেকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। আমায় বললেন, “একটু বসো।”

তারপর সোজা ভেতরে গিয়ে কাঁচের বাটিতে এক বাটি পায়েস, তার ওপর একখানা সন্দেশ সঙ্গে চামচ ও এক গ্লাস জল সহ আমায় নিজ হাতে পরিবেশন করলেন। তারপর আমার কাছে এসে পিঠে আলতো ছোঁওয়া দিয়ে বললেন, “লিখে যাও বাকিটুকু। আমি এক্ষুনি একটুখানি দেখিয়ে দিচ্ছি।” তখন আমার কি যে আনন্দ হচ্ছিল বলে বোঝানো মুশকিল।

পায়েস খাওয়া শেষ হবার পরে উনি আমায় উপরের মলাটের ভেতরের পাতায় দাঁড়ি, কমা, প্যারাগ্রাফ এমন কি শুদ্ধ করে বানান লিখবার কায়দা পর্যন্ত – মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে শিখিয়ে দিলেন। নিজে তখনও স্নান খাওয়া করেননি। একটা অসম্ভবকে সম্ভব করার মনের জোর উনি আমাকে সেই দিন দেখিয়েছেন। তারপর আবার খাতাটিকে নিয়ে পেছনের মলাটের ভেতরের পাতায় ‘যত ধাঁধাঁ মঞ্জুদি’ লেখাটির জন্য তাঁর এই মূল্যবান মন্তব্যটি লিখে দিয়েছিলেন, যেটা আমি সোজাসাপ্টা ওনার ভাষাতেই আপনাদের বলছি।

‘যত ধাঁধাঁ মঞ্জুদি প্রসঙ্গে’ ভূমিকার বদলে-হাসির হয়েও

টুকরো স্মৃতি

জীবনের সফেন সমুদ্রের আভাস। কি বলবো? না গল্প, না ফিচার, না রম্যরচনা। সব মিলিয়ে হয়তো ফিচার গল্প। বাসে যেতে দেখা হয়ে যায় কত রকম চরিত্রের সঙ্গে। বাসে বসেই ভাবা যায় কত গল্প। চেনা মুখের চলমান মিছিল, এরা প্রত্যেকেই আলাদা, আবার আলাদা হয়েও এক। একই বাসের যাত্রী, বাসটা চলমান, জীবনটাও অনেকটা চলমান বাসের মতো। যে কোন সময়েই নেমে যাওয়া যায়। আবার ডেইলি প্যাসেঞ্জারের ব্যস্ত জীবনের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে অনেক রকম নরনারী। মঞ্জুদি শুধু একলা উপলক্ষ মাত্র। তাই যত ধাঁধা মঞ্জুদি শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কেরানী, দারোগা, মন্ত্রী, সাংবাদিক, উকিল, বাস কন্ডাক্টর, ড্রাইভার, বেকার যুবক, সুন্দরী শিক্ষিকা, উঠতি মস্তান, সরকারি কর্মচারী এমনকি রামচন্দ্র সাহেব, অনেকের টুকরো টুকরো ছবি। টুকরো টুকরো হাসি, কৌতুক, ব্যঙ্গ। আধুনিক জীবন জটিলতা নিয়েই হাসির গল্প। সব চরিত্রের প্রতিফলক স্বয়ং লেখক। যিনি নিজেও হয়ে পড়েছেন জীবনের বিচিত্র চরিত্রমালার একজন। দ্রুত ধাবমান আধুনিক জীবনের জটিলতার মধ্যেও কত কৌতূক, কত ব্যঙ্গ, কত রহস্য।

...সমাপ্ত ■

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ সান্দাকফু ২০১৮...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ সুমন চৌধুরী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

সেই প্রজাপতির জন্য

দেবাশিস চক্রবর্তী

নৈঃশব্দের শেষ জানালায়,
মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু,
ঘন কুয়াশার মতো
গাঢ় এক রং!
তবু সূর্য আসবে এক্ষুনি
দুটো পাখি পাশাপাশি
উড়বে অনেকক্ষণ।
আমার প্রতিটা বানানো
গল্প জুড়ে থাকবে
তোমাকে তীব্র অস্বীকার,
তবু তোমার বাড়ির সামনে
দিয়ে হাঁটার সময়,
এক আকাশ রঙ চাইবো আমি
তোমাকে আঁকার মত
অন্তহীন বেদনা চাইবো আমি।
সোনালী রঙের ফসলের ওপর
আজ হয়তো নরম,
এক মেঘের ছায়া ভাসবে।

Photo by Nate Neelson on Unsplash

খোয়াব

আত্মহত্যা করার আগে
ছেলেটা হয়তো আকাশের
দিকে তাকিয়ে ছিলো অনেকক্ষণ,
বোবা বেদনায় মেয়েটা
লুকিয়েছিল পৃথিবীর
সমস্ত অপার্থিব কান্না!
বানভাসী হয়েছি আমরা বহুদিন
চেনা মাটিতে, চেনা-অচেনা ফুল
অচেনা জীবনে, চেনা ভাতের
টুকরো টুকরো গন্ধ।
শব্দ নয় কবিতায়
জীবন আসে প্রতিদিন,
মরা প্রজাপতির পাখায় লাগে রোদ
ভাবতে ভালো লাগে,
হয়তো জীবন কোনও একদিন
আবারো মাথা তুলবে,
সেই প্রজাপতিটা যাবে উড়ে
একদম ওর নিজের আকাশে। ■

Photo by Nate Neelson on Unsplash

ধারাবাহিক উপন্যাস

চার ঋতু-অধ্যায়

রাজশ্রী দত্ত (নীলাঞ্জনা)

(৮)

আজ সকাল থেকেই ঘন কৃষ্ণকালো মেঘে আচ্ছন্ন নীল নীলিমা। কোথাও এক চিলতে আলোর জৌলুস নেই। চারিদিক যেন থমথমে হয়ে আছে। পিকু কাল রাতে অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে একটা বিলাস বহুল হোটেল বুক করতে পেরেছে। দোলের সময় মথুরা বা বৃন্দাবন কোথাও সেভাবে হোটেল পাওয়া যায়না, তার ওপর এ বছর এখানে কুম্ভের মেলা আছে।

দিল্লি থেকে ওদের নিয়ে পিকু মথুরায় গ্রীন ভিউ হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিল। আজ পিকুই ড্রাইভ করে নিয়ে যাচ্ছে। কেয়া আর রীনা ব্যাক সিটে, আর রীনার ছেলে পিকুর সাথে সামনের সিটে। গুনগুন সুরে গান গাইতে গাইতে পিকু গাড়ি চালাচ্ছে। পিকুর গান শুনে কেয়া মুচকি হেসে বলল, “মিস্টার পিকু বাবু তো আজ খুব খোশ মেজাজে আছে দেখছি!” প্রত্যুত্তরে পিকুও মন খোলা হাসি হেসে বলল, “কি করবো ম্যাডাম, কাজের চাপে যতই সিরিয়াস হয়ে থাকি না কেন, নিজের প্রিয় জায়গা, আমার জন্মস্থানের রুট... এখানে এলে আমি বাচ্চা হয়ে যাই।”

— বাচ্চা?

— ইয়েস ম্যাডাম বাচ্চা। দিল তো বাচ্চা হ্যায় জি...

কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পর থেকেই শুরু হল প্রবল থেকে প্রবলতর বর্ষণ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চারিদিক জলে জলে জলমগ্ন হয়ে গেলো। নীচু রাস্তাগুলোতে প্রায় এক কোমরেরও বেশি জল হয়ে গেলো। তার মধ্যেই খুব সাবধানে গাড়ি চালিয়ে এগোচ্ছিল ওরা, কিন্তু ঘটল এক বিপত্তি — সামনের এক গ্যাস সিলিন্ডারের লরি থেকে কয়েকটা সিলিন্ডার পড়ে গিয়ে একটা অযাচিত যানজট আর ঝামেলার সৃষ্টি হয়েছে। ওই জমা জলের মধ্যে শুধু গাড়ির লাইন। পিকুদের গাড়িও আর এগোতে পারে না। কেয়া জানলার কাঁচ নামিয়ে বৃষ্টিটা একটু উপভোগ করবে বলে হাতটা বাইরের দিকে যেই বাড়ায়, রীনা ঝাঁজ দেখিয়ে বলে, “এসি ইজ বেটার দ্যান ইট, প্লিজ ডোন্ট ডু দিস।” রীনার কথাটা কেয়ার মনে ধরল না একটুও। সে জানলার কাঁচটা বন্ধ করে মুখ গোমরা করে বসে রইল। গাড়ির ভিতরের পরিবেশটা হালকা করার জন্য পিকু বলল, “সামনে একটা চায়ের দোকান আছে, চা খাবেন? আর বৃষ্টিটাও ধরেছে। চলুন ওই সামনের দোকানটা থেকে চা খেয়েই আসি।” চারজনে সামনের দোকানে এল। সেখানে অনেক সাধু রয়েছেন – যাঁরা কুম্ভে যাচ্ছেন, তাঁরাও দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের পোশাক, বেশভূষা একেবারে অন্য রকম। কেয়া

ওনাদের সাথেও ওখানে বেশ ভাব জমিয়ে নেয়। কেয়াকে পিকু যত দেখে তত মনে হয় কত যেন চেনা, কত যেন আপন। দুজনে চা পান করতে করতে অনেক গল্প করে। কিছুক্ষণ পর রীনা বলে, "উমেশ হ্যাস কলড ইউ সেভারাল টাইমস, হোয়ার ইজ ইওর সেলফোন?"

— যাহ্, ফোনটা তো গাড়িতেই ফেলে এলাম। আপনারা দাঁড়ান আমি এখনি আসছি।

— পিকু আপনি এখানেই দাঁড়ান আমি নিয়ে আসছি। এই বলে কেয়া গাড়ির দিকে গেল। কিছুক্ষণ পর কেয়া ফিরে এল ফোনটা নিয়ে।

— একটা ফোন আনতে গিয়ে কোথায় চলে গিয়েছিলেন? একি! আপনি তো ছাতা থাকা সত্ত্বেও পুরো ভিজে গিয়েছেন!

— নাহ্, আসলে ভারতের জলবায়ুতে নিজেকে ভিজেয়ে দেখছিলাম। শুনেছি এখানকার প্রকৃতি নাকি সব পবিত্র করে দেয়। তবে ভয় নেই আপনার ফোন কিন্তু একটুও ভেজেনি।

— সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আজ হোটেল কি করে যাবেন? এমন অবস্থা রাস্তার মথুরার দিকে যাওয়াই যাবে না। এখন কি যে উপায় করি!

— আপনার এতো নাম ডাক, আর এখানে একটা হোটেল বা বাড়ি করতে পারেননি?

— এখানে বাড়ি! কেয়ার কথা শুনে পিকুর কপালে

একটা যেন চিন্তার ভাঁজ পড়ল। এদিকে যত সময় যাচ্ছে বৃষ্টি তত বাড়তে থাকছে – আর দুপুর গড়িয়ে বিকালও হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ ভেবে পিকু বলল, " চলুন তবে, উপায় পেয়ে গিয়েছি।"

রীনা উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, "কেয়ার কথা শুনে কি উপায় পেলেন! কোথায় যাব আমরা?"

পিকু মুচকি হেসে বলল, "চলুন না দেখতেই পাবেন। আমরা এখন এই বাঁদিকের সোজা রাস্তাটা ধরে বৃন্দাবন যাবো।"

যমুনার ধার দিয়ে ধার দিয়ে গাড়ি সোজা রোড ধরে এগিয়ে চলছে। সারাদিনের মেঘ বৃষ্টির খেলা শেষে পশ্চিমের মেঘলা আকাশ চিড়ে এক চিলতে অস্তগামী রোদের জাফরানি আভার উঁকি – আর সেই দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ থেকে যমুনার কোন অজানা এক পার পর্যন্ত এক বর্ণালী রামধনু তার সাতরঙে রাঙিয়ে দিয়েছে চারিদিক। এ যেন প্রকৃতির মাঝে কোনো ঐশ্বরিক বসন্ত লীলার এক ঝলক, যা একেবারে অকৃত্রিম, অপার্থিব।

অবশেষে পিকুদের গাড়ি এসে পৌছল একটা পুরানো বাড়ির সামনে। সবার মনে একটাই প্রশ্ন জাগল এই বাড়িটা কার?

...ক্রমশ ■

বীনা তারে বিদ্যুৎ প্রেরণ

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পি. কে.)

আমরা ছোট বেলা থেকেই দেখে আসছি, বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরণের পরিবাহী তার ব্যবহার করা হয়। কিছু তার বিদ্যুৎ নিরোধক আবরণে ঢাকা (Insulated wires), আবার কিছু তার উন্মুক্ত (Naked wires)। কিছু তার খুব মোটা আবার কিছু তার খুব সরু। কিন্তু যেখানেই বিদ্যুৎ প্রেরণের প্রয়োজন হয়, সেখানেই কোনো না কোনো ধরণের পরিবাহী তার বা তাদের সমকক্ষ কোনো ধাতব পরিবাহীর ব্যবহার আবশ্যক।

বিখ্যাত 'সার্বিয়ান-আমেরিকান' বিজ্ঞানী নিকোলা টেসলা-র (১০ই জুলাই ১৮৫৬ – ৭ই জানুয়ারি ১৯৪৩) একটি স্বপ্ন ছিল – কি করে কোন তার বা পরিবাহী বস্তু ছাড়াই বিদ্যুৎ প্রেরণ করা যায় তা আবিস্কার করা। এ কার্যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ না করলেও, তিনি কিন্তু অনেকটাই অগ্রসর হয়েছিলেন। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে টেসলা একটি কুণ্ডলী (Coil) বানাতে সক্ষম হন, যাকে তাঁর নাম অনুসারে বলা হয় টেসলা-কুণ্ডলী (Tesla coil)। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৮ সাল পর্যন্ত টেসলা তাঁর এই

কুণ্ডলীটির সাথে বিভিন্ন অনুরণন-মূলক ‘ট্রান্সফর্মার’ (Resonant transformers) ব্যবহার করে, বেতার কম্পাঙ্কের (Radio frequencies) সাহায্যে, খুব অল্প দূরত্বের ব্যবধানে কোন পরিবাহী ব্যবহার না করেই, বিবর্তিত বিদ্যুৎ (Alternating current) পাঠাতে সক্ষম হন।

নিকোলা টেসলা

১৮৯৬ তে তোলা ছবি

উৎসঃ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N.Tesla.JPG

যদিও বর্তমান যুগে আর টেসলা-বর্তনী-র (Tesla coil) ব্যাপক ব্যবহার নেই, তবুও ‘রেডিও’ বা ‘টেলিভিশন’-এ আজও এরই কিছু সংশোধিত (Modified) সংস্করণ ব্যবহৃত হচ্ছে।

উচ্চ ‘ভোল্টেজ’-এর বিদ্যুৎ প্রেরণঃ

১৯০১ সালে টেসলা উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রেরণের প্রচেষ্টায় কাজ শুরু করেন লং আইল্যান্ড-এর ওপর তৈরি ওয়ারডেনক্লিফ টাওয়ার থেকে, যেটা টেসলা টাওয়ার নামেই অধিক পরিচিত। বিনিয়োগকারীদের কাছে তিনি এই টাওয়ার থেকে তথ্য এবং বিদ্যুৎ দু’টিই পাঠানোর প্রাথমিক প্রকল্পের প্রদর্শনও করেন, কিন্তু প্রথমে রাজী হলেও পরবর্তীকালে জে. পি. মর্গন নামক অর্থপ্রদানের সংস্থাটি পিছিয়ে যায় এবং আর কোন সংস্থাও এগিয়ে না আসায়,

প্রকল্পটি আর অগ্রসর হতে পারেনা। কাজেই টেসলার বেতার বিশ্বের (World Wireless System) স্বপ্নটি স্বপ্নই রয়ে যায়।

এরপর এ বিষয়টির উপর আমেরিকার নাসা (NASA: National Aeronautics and Space Administration) নিজেদের প্রয়োজনে কিছু কাজ করে। 'নাসা'-র পুরানো নথিপত্রের বক্তব্য অনুযায়ী একটা হেলিকপ্টার-ড্রোনকে ভূমি থেকে 'মাইক্রো ওয়েভ'-এর সাহায্যে আধানযুক্ত (Charged) করার ক্ষমতা তারা আয়ত্তে আনে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, এ প্রযুক্তিটিকে তারা আরও পরিণত করে, বাণিজ্যিক সাফল্যের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেনি।

যা হোক, টেসলার কাজ বন্ধ হবার প্রায় শতাধিক বর্ষ পরে, বর্তমান দশকে বিজ্ঞানের এই শাখাটিতে গোটা বিশ্বেই বেশ উদ্যমের সাথে কাজকর্ম চলছে এবং বেশ কিছুটা সাফল্যও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কিছু ছোটখাট পরিবর্তন যা আমরা দেখছিঃ

পাঠকেরা অনেকেই হয়ত তারবিহীন 'মোবাইল চারজিং প্যাড'-এর সাথে আজ সুপরিচিত। আর কিছুদিনের মধ্যেই বোধহয় আমরা বৈদ্যুতিক গাড়িগুলিকেও (Electric cars) এইভাবে আধানযুক্ত (Charged) হতে দেখব। বিশ্বের বেশ কয়েকটা বড় বাণিজ্যিক সংস্থা আজ এই বিষয়ে বিশেষ

অগ্রণী হয়ে কাজ করছে। তাদের কেউবা এই বিষয়টাকেই আরও আগে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, কেউবা এটাকে নিজেদের পণ্যে ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। আসলে টেসলার যুগ থেকে এখনকার সময় অনেকটাই বদলে গেছে। এখন বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ ধরণের বস্তু আবিস্কার করেছেন যাকে বলে 'মেটামেটেরিয়াল' (Metamaterial) বা বিপাকীয় বস্তু। এই বস্তুর ব্যবহারে আজ এই বীনা তারে বিদ্যুৎ প্রেরণের কাজটি অনেক সহজ হয়ে গেছে।

একটি কৌতুহলোদ্দীপক নব্য বাণিজ্যিক প্রয়োগের সূচনা:

আমেরিকার উইট্রিসিতি কোম্পানিটি এই বিষয়ে কাজ করে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সম্প্রতি তারা বিখ্যাত গাড়ির তারবিহীন 'চারজার' প্রস্তুতকারি কোম্পানি লুমেন ফ্রীডম-এর সাথে একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। ঐ চুক্তি অনুযায়ী লুমেন ফ্রীডম তাদের কাজের জন্য উইট্রিসিতির বানানো প্রযুক্তি ব্যবহার করবে এবং তাকে বাণিজ্যিকভাবে প্রসারিত করবে। ■

'ফিটনেস ওয়াচ' ও 'মোবাইল ফোন' তার ছাড়াই আধানযুক্ত হচ্ছে...

উৎসঃ Photo by Studio Proper on Unsplash

ফুটবলের প্রতীক্ষিত পুনরুত্থানে আই. এস. এল.-এর ভূমিকা ঠিক কতটা?

সুজন ভট্টাচার্য

ক্রিকেট এবং হকির পর এবারে তাকানো যাক জাতীয় ফুটবলের দিকে। ফুটবল বরাবরই ভারতীয়দের কাছে খুব প্রিয়। বিশেষ করে বাংলার ফুটবল-প্রেম এবং ফুটবলকে নিয়ে তাদের প্রবল অনুরাগ, উৎসাহ এবং ভাবাবেগ সর্বজনস্বীকৃত।

সম্প্রতি কালের সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং চমকপ্রদ ঘরোয়া ফুটবল টুর্নামেন্ট হিরো আই. এস. এল.-এর ছ'মাসের নম্বর ৭-এর (২০২০-২১) মরশুম সদ্য শেষ হল। গত ১৩ই মার্চে গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে টানটান উত্তেজনায় ভরা ফাইনালে ৯০ মিনিট পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে যাওয়া ১-১ স্কোর লাইনে রাখার পর মণিপুরী মিডফিল্ডার বিপিন সিংয়ের গোলের সুবাদে এ. টি. কে. মোহনবাগানকে পেছনে ফেলে প্রথম বারের মতো এই লিগের চ্যাম্পিয়ন খেতাব জিতল মুম্বই সিটি এফ. সি.।

এত ভাল খেলার পরেও ফাইনালে মুম্বই সিটি এফ. সি.-এর কাছে এ. টি. কে. মোহনবাগানের হারকে মেনে নিতে পারছেন না গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা এদলের সমর্থকদের অনেকেই। বিশেষ করে এদেশ তথা বাংলার সমর্থকেরা।

সবুজ-মেরুন বাহিনীর হতাশ ও বিধ্বস্ত ফুটবলার ও কোচদের কেউই ম্যাচের পরে সংবাদ মাধ্যমে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও, বাংলার ফুটবল মহলে এ নিয়ে চর্চা তুঙ্গে। রাজ্যের ফুটবল বিশেষজ্ঞ তথা প্রাক্তন ফুটবলাররা রীতিমত সরব। অবশ্য একটা ব্যাপারে তাঁরা সবাই একমত যে রয় কৃষ্ণা, ডেভিড উইলিয়ামস, প্রীতম কোটাল, সন্দেশ ঝিঙ্গনদের পারফরম্যান্স মোটেই হারার মতো ছিল না।

গ্যালারিতে দর্শক উপস্থিত না থাকলেও লিগের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অংশ নেন প্রায় ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ। লিগের বিভিন্ন মুহূর্তের মোট চার হাজারেরও বেশি মিনিটের ভিডিও দেখেছেন প্রায় ৩৬ কোটি মানুষ। ভারতবাসীর জীবনে এভাবে ফুটবল ফিরিয়ে আনার সফল প্রচেষ্টার এই বিপুল যজ্ঞ দেখেন মুগ্ধ ক্রীড়া অনুরাগী এবং বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশ।

তাঁরা এটা ভাবতেও পারেননি যে অতিমারি অবস্থার মধ্যে এদেশে এত বিশাল আকারের একটা খেলার আসর সাফল্যের সাথে আয়োজন করা সম্ভবপর হবে। অভিভূত হয়েছেন এমন সব ব্যক্তিদের সুদীর্ঘ তালিকায় রয়েছেন

প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক এবং বাংলা তথা ভারতের গর্ব সৌরভ গাঙ্গুলিও।

লিগের আয়োজক ফুটবল স্পোর্টস ডেভলপমেন্ট লিমিটেডের (এফ. এস. ডি. এল) কাজের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সৌরভ বলেন, “হিরো আই. এস. এল. গোটা খেলার দুনিয়াকে এক নতুন দিশা দেখাল। এই লিগই অন্যান্য খেলার সঙ্গে জড়িত মানুষদের যার যার নিজস্ব মরশুম শুরু করার প্রেরণা জোগাবে।”

কিন্তু লাখ টাকার প্রশ্ন হল যে আই. এস. এল. কি আদৌ ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে সক্ষম হতে পেরেছে? না এটা শুধু এদেশের ক্রীড়া-বিনোদনের বানিজ্যিক সাফল্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়েই থেকে যাবে?

এই প্রসঙ্গে এই কৌতুহল হওয়াটাই স্বাভাবিক যে ক্রোয়েশিয়ার প্রাক্তন বিশ্বকাপার ভারতীয় দলের প্রধান কোচ ইগর স্টিমাচ কি ভাবছেন। তাঁর মতে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই লিগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা অনেকটাই সফল। ভারতীয় ফুটবলকে একাধিক প্রতিভাবান খেলোয়াড় উপহার দেওয়ার জন্য তিনি হিরো আই. এস. এল.-কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

“এবারেও হিরো আই. এস. এল. আমাদের একাধিক নতুন-তরতাজা প্রতিভা উপহার দিয়েছে। এ মরশুমের

পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই জাতীয় দলে ডাকা হয়েছে অনেককে। আই. এস. এল.-কে ধন্যবাদ,” দুবাই থেকে জানান স্টিমাচ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে ২৫ ও ২৯ মার্চে দুবাইয়ে ভারতীয় দলের দু’টি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলার কথা ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে। আপাতত সেখানে ২৭ জন ভারতীয় ফুটবলারকে নিয়ে প্রস্তুতি শিবির চলছে।

ভারতীয় ফুটবল দলের সাম্প্রতিক সাফল্যের পেছনে কি আই. এস. এল.-এর আদৌ কোন ভুমিকা আছে সেকথায় ফেরা যাক।

বিগত ২০১৫-এর মার্চে ভারতীয় ফুটবল দলের বিশ্বমানে স্থান ছিল একেবারে তলানিতে — ১৭৩-এ। কিন্তু বর্তমানে সেটা লক্ষণীয়ভাবে ওপরে উঠে এসেছে — ৯৭-এ। আমাদের কাছে আজ সুনীল ছেত্রি, গুরপ্রীত, সন্দেশ, ঝিঙ্গনদের মতো তারকারা রয়েছেন, যাঁরা অনুপ্রেরণার এবং দিশা দেখানোর মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের ফুটবলারদের গড়ে তোলার কারীগর হতে রীতিমত সক্ষম।

ভারতীয় ফুটবল দলের চিত্তাকর্ষক ও কৌতুহল-উদ্দীপক এই সফরে আই. এস. এল.-এর এক গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে দাবী করছেন এদেশের ফুটবল অনুরাগী এবং বিশেষজ্ঞদের একাংশ।

তাছাড়া অনেকেই মনে করছেন হিরো আই. এস. এল.-এর ইউথ ডেভলপমেন্ট প্রকল্প যার মাধ্যমে বহু খেলোয়াড়, যাদের অনেকেই অনুর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন, তৈরি হয়ে আসছেন সেটা যথেষ্ট সফল এবং ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে অবশ্যই সক্ষম হবে। অনুরাগী এবং বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের মতে হিরো আই. এস. এল.-এর সাফল্যের মূল কারণগুলি হলঃ

অতি প্রয়োজনীয় অর্থের সমাগম – ফুটবলাররা এখন উপযুক্ত অথবা যোগ্য অর্থ উপার্জন করতে পারছেন।

পরিকাঠামোর প্রভূত উন্নতি – ধীরে ধীরে আই. এস. এল.-এর চমক এবং তাতে আকর্ষী একঝাঁক বিদেশী ফুটবল তারকারদের অনুপ্রবেশ – এদেশের ফুটবল পরিকাঠামোকে ক্রমে ক্রমে ফিফা (FIFA) তথা বিশ্ব মানের করে তোলার পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

মূল স্তরের প্রকল্প – আই. এস. এল. যেন স্থানীয় ক্লাবগুলির মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার ঘটিয়েছে। ইদানিং মূল স্তরে ক্লাবগুলির মধ্যে আবার ক্ষুদেদেরকে নিয়ে ফুটবলার গড়ার আঁতুড়ঘর হওয়ার উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বহুল পরিমাণে ব্রডকাস্টারদের উপস্থিতি – নব উৎসাহে গণমাধ্যমের বিপুলাকারে যোগদান দেশের প্রতিটি কোণায় এবং ঘরে ঘরে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তার জৌলুসের কাছে

পিছিয়ে পড়া ফুটবলকে নতুনভাবে জনপ্রিয় করে তুলতে সক্ষম হচ্ছে।

সোশ্যাল মিডিয়ার বিপুল উপস্থিতি – পরম্পরাগত মিডিয়ার পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপকভাবে এবং তীব্রতার সাথে যোগদান ভারতীয় ফুটবলে এক নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছে, যা জাতীয় ফুটবলকে বিশ্বের মানচিত্রে উপস্থাপনা করতে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারে।

সমালোচক অথবা নিন্দুকদের কথায় কর্ণপাত না করলে বলতে হয় যে – ভারতীয় ফুটবলের পুনরুত্থান এবং পুনরুজ্জীবনের জন্য যে বিশেষ চমক কিংবা স্ফুলিঙ্গের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল তা হয়তো আই. এস. এল. ইতিমধ্যেই কিছুটা হলেও দিতে পেরেছে। অনতিদূর ভবিষ্যতই বলে দিতে পারবে এই লীগ ভারতীয় ফুটবলকে কতটা উজ্জ্বল আগামী দিনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে... ■

Image by Jeet Saha from Pixabay

আলোকচিত্র

ছবির নামঃ স্নেহ...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

আপনি কি আলোকচিত্র গ্রহণ করতে ভালবাসেন? তাহলে আপনার গ্রীহিত কিছু সুন্দর আলোকচিত্র 'গুঞ্জন'-এর দপ্তরে পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত কিছু আলোকচিত্র আমরা 'গুঞ্জন'-এর আগামী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

আমাদের ই-মেলঃ contactpandulipi@gmail.com

নারী শতরূপে তুমি

হাজেরা বেগম (আমেরিকা)

খোল খোল মাথার ঐ ঘোমটা
বেড়িয়ে এসো দেখো জগতটা।
নারী আর থেকো না আড়ালে
বাহিরে এসো সবে দলে দলে
ভেঙ্গে ফেলো শিকলের শাসন
দূর করে দাও দাসত্বের আভরণ।
আজ আর কোন লজ্জা নয়
নয় কোন রক্ত চক্ষুর ডরভয়।
পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে
পাশাপাশি হেঁটে চলো এগিয়ে...
প্রতি ঘরে হোক নারীর প্রতিষ্ঠা
সমাজে পোক্ত হোক নিজ মর্যাদা।
নারী তুমি মা মাতা মমতাময়ী
তুমি সকলের তরে অভয়বানী।
নারী বিনা জগত সংসার অচল
নারী ছাড়া জগতের সবই বিফল।
যুগে যুগে নারী নিজ কর্মে মহীয়ান
নারী আজ বিশ্ব জয়ে আগুয়ান।
নারী তুমি জায়া জননী ধরিত্রী
শতরূপে তোমার তুমি মনোহরিনী।। ■

আলোকচিত্র
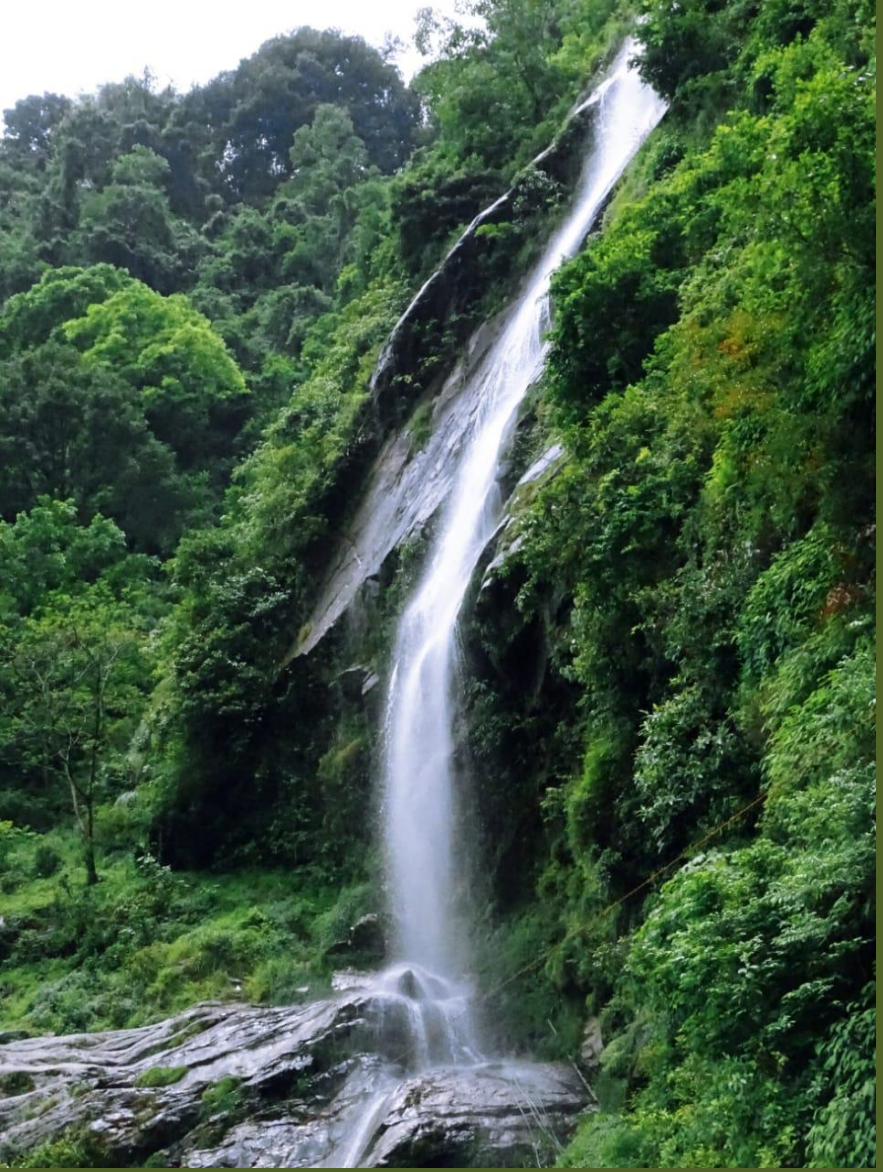
ছবির নামঃ প্রবাহ...

আলোকচিত্র গ্রাহকঃ শুভাশীষ মুখার্জী

সবাই জানাবেন এই আলোকচিত্রটি কেমন লাগল...

বৃত্ত

ডঃ মালা মুখার্জী

"জানিস দাদা, আমার মেয়েটা ইউ.কে. তে রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছে।" সুকন্যার ফোনটা পেয়ে শুভাশীষবাবুর মাথাটা একটু গরম হয়ে গেল। এই হলো মেয়েমানুষের বুদ্ধি, আবার তায়ে যদি বিধবা মহিলার হাতে মেলা টাকা থাকে। মুখে দেঁতো হাসি হেসে, বোনকে আর ভাগ্নিকে কনগ্র্যাচুলেট করে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন শুভাশীষবাবু।

স্ত্রী পৃথা রান্নাঘর থেকে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করলেন ফোনটা কার।

– কার আবার? তোমার আদরের ননদের...

– "তা অমন কেটে দিলে যে?" পৃথা একটু অবাক হলেন। সাধারণত বোন ফোন করলে, বৌদি আর ভাইপো-ভাইঝির সাথেও কথা কয়।

– আদ্রিতা ইউ.কে. যাবে, স্কলারশিপ পেয়েছে। নিমপাতা খাওয়া গলায় শুভাশীষবাবু বললেন। মেয়ে শুভমিতা পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, "ওমা, এতো ভালো খবর বাবা, আদ্রিতাদিকে কনগ্র্যাচুলেট করতাম, টোয়েফলের কোচিং নিয়ে আলোচনা করতাম। ফোনটা রেখে দিলে কেন?"

রেনেসাঁ

– দেখো শুভমিতা, আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ওই পিসতুতো দিদিকে দেখে মাথা খারাপ করো না। মেয়েমানুষের আসল জায়গা ঘরে। তোমার পিসেমশাই বেঁচে থাকলে ছাব্বিশ বছরের মেয়েকে এমন আইবুড়ো বসিয়ে রেখে বিদেশ পাঠাতো না। নেহাত মেয়েমানুষর বুদ্ধি তাই...

বাবার কথায় শুভমিতা মাথা নীচু করে ঘরে ফিরে যায়। ওর এখন ইংলিশ অনার্সের ফাইনাল ইয়ার, দু'বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাবার সাফ কথা জয়েন্ট পেলেও মেয়ের পিছনে অত খরচ করবেন না। তাই কাছের কলেজে ইংলিশে ভর্তি হয়েছে শুভমিতা।

কাঠের সেন্টার টেবিলের ওপর রবিবারের নিউজপেপারটা পড়ে, স্থানে স্থানে লাল দাগ দেওয়া, মানে সম্ভাব্য সুপাত্রের বিজ্ঞাপন। আজ প্রায় তিনবছর ধরে বাবা ওকে পাত্রস্থ করার চেষ্টা করছেন, নেহাত গায়ের রঙটা চাপা বলে কারো পছন্দ হচ্ছে না।

– যাও পার্লার থেকে একটু ঘুরে এসো। বাবা হাতে পাঁচশোর দুটো নোট ধরিয়ে বললেন, "আজ বিকেলে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে।" অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুভমিতা বেরিয়ে গেল । মনে মনে আদ্রিতাদিদিকে হিংসেও হলো । পিসি খুব অল্প বয়সে বিধবা, পিসেমশাইয়ের দপ্তরে একটা স্বল্প মাইনের কাজ করেন। নিজের চাকরিটা কম্পেশন গ্রাউণ্ডের হলেও আদ্রিতাদিদিকে সাবলম্বী

বানানোর চেষ্টায় কোনো ঘাটতি নেই। বাবার অবশ্য পিসির সিদ্ধান্তকে বাড়াবাড়ি মনে হয়!

শুভমিতার এ সম্বন্ধটা লেগে গেল। ছেলেটি সরকারী চাকরি করে, বয়সটা বেশী, তাই ডাকসাইটে সুন্দরী না হলেও ঘরোয়া পাত্রী হিসেবে শুভমিতাকে পছন্দ হলো, অবশ্য পাত্রের মা আর দিদি সোনার গয়না, ফার্ণিচার আর মোটরবাইকের লিস্টটা জানাতে ভুললেন না, শত হলেও সরকারী চাকুরে ছেলে!

অগ্রায়ণেই ফাইনাল পরীক্ষা মুলতুবি রেখে শুভমিতা বিয়ের পিঁড়িতে বসলো। আদ্রিতাদি আসেনি, সুকন্যা পিসি সোনার পেন্ডেন্ট নিয়ে আশীর্ব্বাদ করতে এলেন, শুভাশীষ বোনকে ঠেস দিয়ে বললেন, “এভাবে অন্যের মেয়ের বিয়েতে সোনা দানা না বিলিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্য রাখতে পারতিস।”

– “আমার মেয়ে এভাবে বিয়ে করবে না, দাদা । আর ওর জন্য আমায় কখনো টাকাপয়সা খরচ করতে হয়নি, বরাবর স্কলারশিপ পেয়েছে।” সুকন্যা গর্বের সাথে বলল। শুভমিতার মাসীশাশুড়ী কৌতহুলী হয়ে বলে উঠলেন, “যাই বলুন দিদি, মেয়েদের বিয়েটাই সব। আপনার মেয়ের তো বয়সও হলো। আর পাত্র পাবেন?”

– “আমি চাই ওর পায়ের তলার মাটিটা শক্ত হোক,” সুকন্যা নিজেকে বিয়ের মণ্ডপ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল,

বিধবা পিসির থাকাটা যদি কারো দৃষ্টিকটু লাগে। তবে সুকন্যা চলে গেলেও বিয়েবাড়ীর আলোচনাটা ওকে ঘিরেই রয়ে গেল। শুভমিতার ননদ বলল, "মা নিশ্চয় মেয়ের চাকরির টাকায় খাবে, কিংবা মেয়ের কোনো খুঁত আছে।" আইবুড়ো মেয়েরা বাইরে একা থাকলে কি কি হতে পারে তার নিদারুন কল্পকাহিনী এবং বেশী বয়সে বিয়ে হওয়া কোনো মেয়ের বারম্বার মিসক্যারেজের গল্পে বিয়েবাড়ীর মেয়েমহল ভরে উঠলো। শুভমিতা দেখল সুকন্যা পিসি প্রথম ব্যাচেই খেয়ে চলে গেলেন।

ক্রমশ ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা না দেওয়ার দুঃখটা শুভমিতা ভুলে গেল দামি হানিমুন প্যাকেজ, আর বহুমূল্য শাড়ী গয়নায় । আজকাল যখন বাপের বাড়ী এলে শুভমিতা দামী গাড়ী থেকে নামে, পড়শীরা টেরিয়ে দেখে। বছর ঘুরতে না ঘুরতে শুভমিতার কোলে এল শ্রেয়া, মেয়ে সন্তান দেখে শাশুড়ী খুশী না হলেও মেনে নিলেন, নিশ্চয় পরের বার বংশধর আসবে ভেবে। ইতিমধ্যে তার দেওর ছোটোখাটো একটা প্রাইভেট জব পেয়েছে, ওরও বিয়ের কথা চলছে। এত কিছুর মধ্যে শুভমিতার মাথা থেকে আদ্রিতার কথাটা বেরিয়েই গিয়েছিল। দেওরের বিয়েতে পিসিকে নিমন্ত্রনের জন্য ফোন করতেই সে জানতে পারলো আদ্রিতা এখন দিল্লিতে কোথাও পড়াচ্ছে, ও ওখানেই ফ্ল্যাট নিয়েছে আর পিসি ওখানেই থাকেন, সুতরাং নিমন্ত্রন রক্ষার

প্রশ্নই ওঠে না ।

শাশুড়ী শুনে একবার বললেন, “বিয়ে-থা করেছে না এমনিই থাকে? আজকালকার চাকরি করা মেয়েরা খুব স্বার্থপর। বিয়ে করলে তোমার পিসির একটা কর্তব্য শেষ হয়ে যেত...” কথাটায় শুভমিতাও সায় দেয়। কোথায় শেষ বয়সে পিসি নাতি-নাতনি নিয়ে খেলবেন, তা নয় বিদেশ-বিঁভুইয়ে পড়ে আছেন। বাবার মতোই শুভমিতাও বিশ্বাস করে সুখী গৃহকোনের তত্ত্বে, কিন্তু তখনও কি ভেবেছিল যে ভগবান অলক্ষ্যে হাসছেন?

যেদিন ভাইয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন সেরে ফেরার পথে একটি দুর্ঘটনায় শুভমিতার স্বামী মৃন্ময় চলে গেল, সেদিনই যেন তাসের ঘরের মতো তার সংসার ভেঙে পড়লো। মৃন্ময়ের অফিস থেকে শুভমিতাকে কম্পেনশেসন গ্রাউণ্ডে চাকরি দেওয়ার অফার করলো, কিন্তু বাধ সাধলেন শাশুড়ীমা। ঘরের বৌয়ের বাইরে গিয়ে সামান্য সাবক্ল্যারিকাল চাকরি করা শোভনীয় নয়, আর তাছাড়া বৌমার কোয়ালিফিকেশনই বা কি? যদি ওনার ছোটো ছেলে চাকরিটা পায়, তাহলে পরিবারটা ভেসে যাবে না। কতকটা বাধ্য হয়ে শুভমিতা রিফিউজাল ফর্মে সইটা করে দিল।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শুভমিতা বুঝলো নিজের বিষয়ে বা মেয়ের কোনো বিষয়ে কাকাই শেষ কথা। চিরকাল সবকিছু মেনে চলা শুভমিতার মাঝে মাঝেই পিসির

সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শুভমিতা কোথায় যাবে, কি করবে সবই পর-ইচ্ছাধীন। ইতিমধ্যে সে এটাও বুঝে গেছে যে ওর বাবার বাড়ীও এখন ভাইয়ের বাড়ী, রোজ রোজ সেখানে যাওয়াটাও শোভনীয় নয়। দাঁতে দাঁত চেপে শ্রেয়াকে মানুষ করার পণ নিয়েছে শুভমিতা। যদিও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির মতো কানের কাছে সেই কথাগুলো বাজতেই থাকে, যেগুলো সুকন্যাপিসিও কুড়ি বছর আগে শুনেছেন আত্মীয়দের থেকে।

শ্রেয়া অবশ্য শুভমিতার মনে আশা জাগিয়ে ফার্ষ্টক্লাস নিয়ে গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট করলো, তার আশা আরো পড়বে। দিল্লির একটা নামকরা ইউনিভার্সিটিতে এন্ট্রান্সও ক্লিয়ার করেছে সে, আজ শ্রেয়া ভেবেছে কাকাইকে কথাটা বলবে। অবশ্য বললেই যে উনি রাজী হবেন তা নয়, শ্রেয়ার কাকাতো ভাই রাজীবও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এডমিশন নেবে, অনেক খরচা। তবুও শুভমিতা রাজীবের ফেভারিট গাজরের হালুয়া বানিয়ে ডাইনিংরুমে ঢুকতেই নজরে পড়লো রবিবারের কাগজের পাতাটা, কয়েকটা জায়গায় লাল দাগ দেওয়া, দাবিহীন পাত্রের জ্বাজ্বল্যমান বিজ্ঞাপন। ছোট জা সুলোচনা বলে চলেছে, “দাদার সংসার অনেক টেনেছ, এবার ভালোয় ভালোয় আপদটাকে নামাও তো। রাজীবের কথাটাও ভাবো তো... হাজার হোক, বংশের একমাত্র পুত্র সন্তান।”

– "আরে বাবা, চেষ্টা তো করছি," দেওরের গলা পেল শুভমিতা। "খরচখরচা তো আছে নাকি? তাছাড়া শ্রেয়ার মা কি এখন বিয়ে দিতে রাজী হবে ?"

"না ঠাকুরপো," শুভমিতা বলল, "শ্রেয়া দিল্লি গিয়ে পড়বে!"

"এত টাকা কোথা হতে আসবে বৌদি?" মনের বিরক্তি চেপে রেখে দেওর প্রশ্ন করে ।

"গয়নাগুলো বেচে দিইছি, আর তোমার দাদার একটা এলআইসি ম্যাচিওর হয়েছে। আমি জানাতে এসেছি যে আমি আর শ্রেয়া পরের সপ্তাহে দিল্লি যাচ্ছি, মেয়েকে ভর্তি করে, হোস্টেলে রেখে, দুসপ্তাহ বাদে আসবো। আর হ্যাঁ, ওই ক'দিন আমি পিসির বাড়ী উঠছি। সুলোচনা, এই কয়েকটা দিন সংসারটা তুমিই চালিও..." গাজরের হালুয়ার প্লেটগুলো টেবিলে রেখে চলে আসতে আসতে শুভমিতা শুনতে পেল দেওরের গলা, "বৌদি ভুল করছে, মেয়েকে বাইরে ছাড়ার কি আছে? মহিলার হাতে টাকা থাকলে এমনই হঠকারি সিদ্ধান্ত নেয়..."

শুভমিতা হাসলো, মা-মেয়ে দুই প্রজন্মের মানুষ, কিন্তু ইতিহাসটা বোধহয় একই পথে আবর্তিত হচ্ছে। তবে শুভমিতা আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, নিজের জীবন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি মেয়ের জীবনে চায় না সে, মেয়েকে এই বৃত্ত থেকে ও বাইরে আনবেই। ■
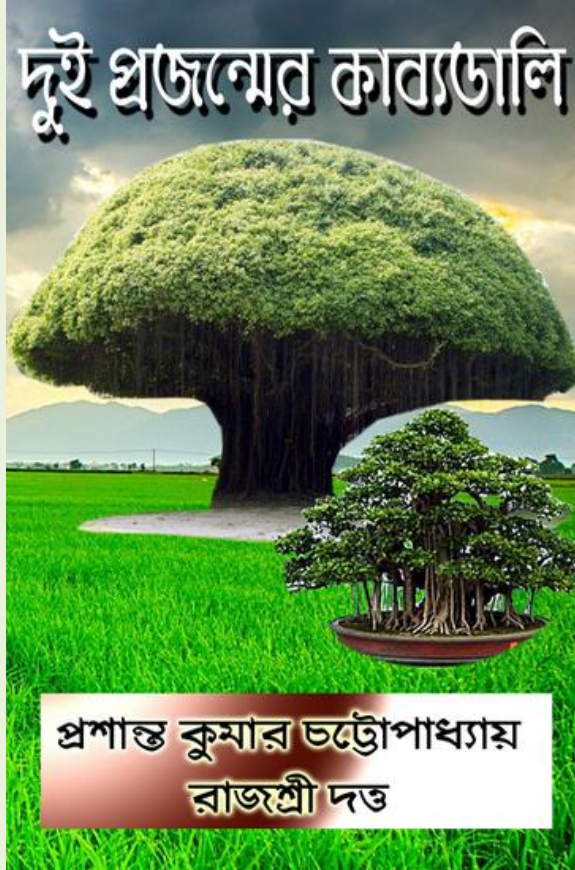
আনাড়ি

প্রণব কুমার বসু

হোক না তোমার শরীর খারাপ
কিংবা মাথা ব্যাথা
সকাল হলেই আমায় ডেকে
চা-টা দেওয়ার কথা।

হলেই তুমি মা বা দিদি
কিংবা হলে স্ত্রী
তোমার জন্য পৃথিবীতে
নেই যে কিছুই ফ্রি।

পছন্দসই পোশাক যেই
নিজের মতো পরা
গালিগালাজ শুনতে হবে
এমনই বসুন্ধরা।

সবার শেষে জুটবে খাবার
পেট যদি না ভরে
হাসি মুখে থাকতে হবে
থাকবে চুপটি করে। ■

গুঞ্জন পড়ুন ৯ গুঞ্জন পড়ান

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ রাণী...

শিল্পীঃ রুদ্র দাস ✧ বয়সঃ ৯ বছর

ছবির নামঃ তথাগত...

শিল্পীঃ রুদ্র দাস ✧ বয়সঃ ৯ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিগুলো কেমন লাগল...

দিদির ভাতের হোটেল

অরুন্ধতী চক্রবর্তী

উফ, বিরক্ত!!... গাড়িটা এখানেই বিগড়োতে হল! চারদিক ধূ ধূ করছে। সিঙ্গুরের দিকে যাচ্ছিলাম একটা কাজে, আমার নতুন ফ্যাক্টরির জন্য একটা জায়গা দেখতে গেছিলাম। শিবতলা পেরোতেই গাড়ি 'ঘ্যাচ' শব্দ করে থেমে গেলো। এদিকে খিদেতে পেটে ইঁদুর ছুঁচোর দৌড় শুরু হয়ে গেছে। সেই সকালে দুধ, কর্নফ্লেক্স, কলা খেয়ে বেড়িয়েছি... পেটে থাকে নাকি এতোটা সময়? মায়ের হাতের সেই লুচি, সাদা তরকারি বা আলুর পরোটা খেলে অনেকটা সময় পেটে থাকতো। এখন আর সে সবের বালাই নেই। হঠাৎ খিদে পেলে যাতে খেতে পারি তাই মিলি আমার সাথে আলমন্ড বাদাম, দুটো বিস্কুট, কয়েকটা কিসমিস এইসব দিয়ে দেয় গাড়িতে। ওইসব ছুলুমছালুম খেয়ে কি আর পেট ভরে? মেজাজটা বিগড়ে গেছে!

"কি হল গোবিন্দ?" গোবিন্দ আমার গাড়ির চালক। অনেকদিন ধরে আমার কাছে কাজ করছে। খুব কর্মঠ আর বিশ্বাসী। আমার আর একটা গাড়ি আছে, ওটা মিলি নিজেই চালায়। ওর আবার অন্য কেউ গাড়ি চালাবে সেটা পছন্দ নয়। ও বলে তাতে নাকি প্রাইভেসি নষ্ট হয়।

"মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে দাদা। দাঁড়ান, একটা ফোন করি, কাছে ধারেই রবিনের গ্যারাজ আছে। ও এসে দেখে যাক।"

অগত্যা, অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই। গোবিন্দ ফোনে কথা বলছে। আমি গাড়ি থেকে মিলির দিয়ে দেওয়া খাদ্যসামগ্রীর থেকে মনমতো কিছু খুঁজে খাওয়ার বৃথা চেষ্টা করছি! দুপুর প্রায় শেষের দিকে, ভেবেছিলাম একেবারে অফিসে গিয়ে লাঞ্চ করবো। বাড়ি থেকেই লাঞ্চ আসে আমার, মিলি বাইরের খাবার খেতে দেয় না। এখন তো মনে হচ্ছে সে গুড়েও বালি! গোবিন্‌দরও মনে হয় খিদে পেয়েছে। মুখটা শুকিয়ে গেছে।

"রবিন এখুনি আসছে দাদা, একটু অপেক্ষা করুন।" কিছুক্ষণ পরে রবিন এলো সাইকেলে করে, একজনকে পিছনে বসিয়ে। গাড়ি পর্যবেক্ষণ করে জানালো, ওরা যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে এখানেই গাড়ি মেরামত করে দেবে, ঘন্টা দেড়েক সময় লাগবে।

উফ, কী জ্বালা... জিজ্ঞেস করলাম অন্য কোনো গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতে পারবে কিনা! রবিন বললো অন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা যাবে না, তবে আশ্বাস দিলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাড়ি ঠিক করে দেবে।

"গোবিন্দ, ভীষণ খিদে পেয়েছে। তোমারও তো পেয়েছে মনে হচ্ছে!"

"হ্যাঁ দাদা, তা পেয়েছে। কিন্তু এখানে আপনি কোথায় খাবেন? আছে কয়েকটা ধাবা... কিন্তু আপনি তো বাইরের খাবার খান না!"

"কিন্তু না খেয়ে এই পড়ন্ত দুপুরে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে কিছু খেয়ে নিলে হতো না?" ছোটবেলা থেকে আমি খিদে একেবারেই সহ্য করতে পারি না...

গোবিন্দ হাসে। "দাঁড়ান দাদা, রবিন বলতে পারবে এখানে ভালো খাবার দোকান কিছু আছে কিনা... চারিদিকে তো তেমন কিছু চোখেও পড়ছে না... রবিন, এখানে ভালো হোটেল আছে রে?"

"একটা হোটেল আছে গোবিন দা... দিদির ভাতের হোটেল। অনেকদিনের পুরোনো। অপূর্ব রান্নাবান্না। আমরা সময় পেলেই ওখানে খেতে চলে যাই। সোজা গিয়ে সামনেই দেখবে রাজ ধাবা, একটা ঢালু মতো জায়গা আছে, নেমেই দিদির ভাতের হোটেল..."

"পরিষ্কার পরিছন্ন তো?"

"হ্যাঁ গোবিন্দ দা... খুব পোস্কার আর হেব্বি রান্না..."

"কী দাদা, যাবেন নাকি?" গোবিন্দ জিজ্ঞেস করে।

আমার তখন খিদেতে এখন তখন অবস্থা... দুজনে হাঁটা শুরু করলাম। রোদ যেন ভীষণ রেগে গিয়ে ব্রহ্মতালু জ্বালিয়ে দিচ্ছে। ঢাল বেয়ে এসে নামলাম হোটেলের সামনে। পাকা দেওয়ালের উপর টিনের চাল, মলিনতার

ছাপ চারিদিকে। একটা রংচটা টিনের গায়ে সাদা রঙ দিয়ে লেখা 'দিদির ভাতের হোটেল'। গোবিন্দর মুখে উদ্বেগের ছাপ স্পষ্ট।

"এখানে খেতে পারবেন দাদা? নাকি অন্য কোনো জায়গায় যাবেন? বৌদি জানতে পারলে কিন্তু খুব রাগ করবেন।" গোবিন্দসহ আমার অফিসের সবাই মোটামুটি জানে তাদের মালকিন কী অসম্ভব বাড়াবাড়ি করে আমার খাওয়াদাওয়া নিয়ে!

"ধুর, ছাড়ো তো... খিদেয় মরছি!!... এখন খেয়ে বাঁচলে তবে তো তোমার বৌদির সাথে দেখা হবে!"

দুজনে ঢুকলাম হোটেলে... পড়ন্ত বেলায় হোটেল মোটামুটি ফাঁকা। চার পাঁচজন মজুর গোছের লোক তৃপ্তি সহকারে ভাত খাচ্ছে... হোটেলের ভিতরটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এতটুকুও ধুলোবালি নেই কোথাও। নিপুণ হাতে কেউ যেন সবকিছু যত্নে সাজিয়ে রেখেছে, যেখানে আভিজাত্যের ছাপ নেই কিন্তু আন্তরিকতা আছে। টেবিল চেয়ার পাতা। মাথার উপর পাখার হাওয়াটা সত্যিই ভালো লাগছে। একজন কমবয়সী ছেলে তড়িঘড়ি দৌড়ে এসে বসতে বললো... পোশাক আশাকে আন্দাজ করেছে কিছুটা।

"খাবেন তো?"

উত্তরটা গোবিন্দ দিলো। "হ্যাঁ, খাবো। এখন কী পাওয়া যাবে ভাই?"

স্নেহ

ততক্ষণে দোকানের মালিকও ছেলেটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মালিকটির বয়সও বেশ কম।

"বসুন স্যার বসুন। সব আছে। ভাত, ডাল, আলুপোস্ত, ভাজা, মাছ সব আছে।"

গোবিন্দ আমায় একটা আলাদা টেবিলে বসিয়ে নিজে পাশের একটা আলাদা টেবিলে গিয়ে বসেছে।

"আমার পাশের চেয়ারটায় এসে বসো গোবিন্দ। একসাথেই খাবো।"

ইতস্ততঃ করতে করতে গোবিন্দ এসে বসলো আমার পাশটিতে।

"তাহলে কী দেবো স্যার? আমাদের এখানে স্পেশাল মেনুও আছে কিছু..." দোকানের মালিক বললো।

গোবিন্দ লোকটিকে থামিয়ে দিলো। "শুধু মাছ আর ভাত নিয়ে এসো দুটো। কি দাদা, তাইতো?" বরাবরের খাদ্যরসিক আমি ওই 'স্পেশাল মেনুর' লোভ ছাড়তে পারলাম না। জিজ্ঞেস করেই বসলাম, "তা তোমাদের স্পেশাল মেনুতে কি কি আছে শুনি?"

ছেলেটি দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করলো, "আজ্ঞে, কচুর শাক ছোলা দিয়ে, কচুর লতির সর্ষে ঝাল, শাপলা ভাজা, চিংড়ি দিয়ে মুসুর ডাল, তেতো ছাড়া সুক্তো, থানকুনি পাতার বড়া, পোস্তর বড়া..."

শুনে তো আমার চক্ষু চরকগাছ! বলে কি ছোকরা! এই

সব রান্না এখনও হয়? সেই মায়ের হাতের রান্নার কথা মনে করিয়ে দিলো...

জিজ্ঞেস করলাম “এখন ওইসব পাওয়া যাবে কি?”

ছেলেটি বললো “অবশ্যই, আপনি শুধু বলুন এখন কি কি খাবেন?”

গোবিন্দ যারপরনাই অবাক চোখে আমায় দেখছে। বললাম, “সুক্তো, চিংড়ি দিয়ে ডাল, কচুর শাক, পোস্তর বড়া... এই আপাতত নিয়ে এসো, পরে বাকিটা বলছি। কি গোবিন্দ চলবে তো?”

গোবিন্দ আমার এই রূপ আগে কোনোদিন দেখে নি। হতবাক হয়ে কথার ভাষা হারিয়েছে বোধহয়। মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো কেবল কিছুক্ষণ পরে টেবিলে কলাপাতা আর মাটির গ্লাস দিয়ে গেলো। সঙ্গে নুন, লেবু। গরম ধোঁয়া ওঠা ভালো চালের ভাত, সাথে পোস্তর বড়া, মাটির ছোটো ছোটো বাটিতে সুক্তো, ডাল, কচুর শাক। সুক্তো দিয়ে ভাত মেখে খাওয়া শুরু করলাম আমরা। আহা, অমৃত। কচুর শাক ছোলা দিয়ে। মুখে দিতেই চমকে উঠলাম! বড়ো পরিচিত এই স্বাদ! একেবারে যেন মা আর রানুদির হাতের তৈরী খাবার। পোস্তর বড়া ভেঙে একটু মুখে দিলাম, হুবহু একই স্বাদ, মুখে দিলেই মিলিয়ে যাচ্ছে! পুরোটা খেতে পারলাম না। চোখে জল চলে আসছে। খাওয়া থামিয়ে দিয়েছি। মুখটা হঠাৎ বিস্বাদ হয়ে গেছে...

"অসুবিধা হচ্ছে, না দাদা? আমি জানতাম, আপনার এসব জায়গায় খেতে খুব অসুবিধা হবে।" গোবিন্দ অপ্রস্তুত।

"তুমি বসে খাও গোবিন্দ। আমি একটু মালিকের সাথে কথা বলে আসি।"

মালিক অবধি পৌঁছাতে হল না। অপরাধীর মতো মুখ করে মালিক এসে আমাদের টেবিলের সামনে উপস্থিত হল। "কি অসুবিধা হলো স্যার? খাবার ভালো লাগলো না? অন্য কিছু দেবো?" আর পারলাম না। উঠে এসে মালিকের হাত দুটো ধরে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনাদের এখানে কে রান্না করে ভাই?"

বেচারা তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। "কেন স্যার?"

"প্লিজ বলুন, আমি একবার তার সাথে দেখা করতে চাই।"

"এক বয়স্কা দিদি আছেন। প্রথম প্রথম উনিই রান্না করতেন, এখন আর পারেন না। দু'তিন দিন ছাড়া ছাড়া আসেন এখানে, উনিই বলে বলে দেন, দুটি মেয়ে আছে, ওরাই রান্নাবান্না করে।"

"কে, কে তিনি? আমি একবার দেখা করতে চাই ওনার সাথে। ওনার নাম বলতে পারবেন?"

"স্যার, আমরা ওনাকে ননীদি বলেই ডাকি। বাবার আমলের লোক। আগে দোকানের নাম ছিলো নিস্তারিণী

হোটেল, আমার ঠাকুমার নামে। খুব একটা চলতও না তেমন। ননীদি আসার পরে হোটেলের পসার অনেক বেড়েছে। অপূর্ব রান্নার হাত ননীদির। দূর দূর থেকেও অনেকে আসে খেতে। একবার যে খেয়েছে সে বারবার আসে স্যার। বাবাও দিদি ডাকতেন, আমিও দিদি ডাকি, সবার দিদি... বাবা হোটেলের নাম বদলে রাখলেন দিদির ভাতের হোটেল। বাবার বয়েস হয়েছে, তাই আমিই বসি। ননীদি আমাদের বাড়ির কাছেই থাকেন। একা বিধবা মানুষ।। কালকে আবার আসবেন দোকানে।"

নামটা শুনে একটু দমে গেলাম, অপরিচিত নাম, অপরিচিত মানুষ। এভাবে উত্তেজনা না দেখালেই হত। তাও কেমন যেন কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। দাম মেটাতে গিয়ে অবাক হলাম, খাবার দাবারের দাম এতো কম? ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করতে সে জানালো খাবারের দাম কম রেখেছে যাতে সবাই খেতে পারে। আর ননীদি নাকি বলেন মানুষকে খাইয়ে যে তৃপ্তি তা নাকি আর কিছুতে নেই। তাই সামান্য দাম নিতে হবে যাতে সবাই খেতে পারে।

অবাক হলাম। বললাম, "আমি কালকে একবার আসবো এখানে। কখন আসবো?"

"স্যার আপনি সকালের দিকটা আসুন। বেলার দিকে ভীড় বাড়তে থাকে। ননীদি সকাল ছ'টা থেকে দশটা অবধি

থাকেন, তারপর চলে যান। আমার ফোন নাম্বারটা রাখুন।”

ফোন নাম্বারটা নিয়ে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। ততক্ষণে রবিনেরও গাড়ি সারানো হয়ে গেছে। টাকাপয়সা মিটিয়ে গাড়িতে বসেছি। গোবিন্দকে বললাম, “আজকের ঘটনা নিয়ে কারোর সাথে আলোচনা করো না গোবিন্দ, কালকে সকাল সাতটায় তৈরী থেকো, আগে এখানে একবার আসবো, তারপর অফিসে ঢুকবো।”গোবিন্দ মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

রাতে বাড়ি এসে মনটা কেমন যেন ভারাক্রান্ত হয়ে রইলো। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মিলিকে বললাম আজ অনেক কাজ ছিলো, খুব ক্লান্ত। মিলিও কথা বাড়ায় নি। নয়তো, এই সময়টা আমার পরিবারের। মিলি আর আমি সারাদিনের ঘটা বিভিন্ন ঘটনা একে অপরের সাথে ভাগ করে নিই। মেয়েকে ফোন করি। অদ্ভুত স্বভাববের মেয়ে মিলি। বড়ো চাকরি করে, নিজের মতকেই বেশি প্রাধান্য দেয়। আমাদের একমাত্র মেয়ে সুনয়না বেঙ্গালুরুতে পড়াশোনা করছে। মা মারা গেছেন প্রায় সাত বছর হল। বিয়ের পর মিলি এসেই মায়ের হাত পুড়িয়ে রান্না করাটা বন্ধ করে দিলো। মা খুব চুপচাপ ছিলেন বলে প্রতিবাদ করেন নি কোনোদিন, কিন্তু মনে মনে কষ্ট পেতেন। রান্নাঘরটা ছিলো মায়ের জগৎ। মিলির মতে রান্না করা ছাড়াও মানুষের করার মতো আরো অনেক কিছু

আছে। মায়ের ঘরে আলাদা টিভি এলো, মায়ের জন্য নানা রকমের বই এলো, সেলাইয়ের বিভিন্ন উপকরণ এলো। তাও মা কেমন যেন মনমরা হয়ে যেতে লাগলেন। মায়ের হাতে বানানো সাবেকি রান্নাগুলো মোটামুটি তখন থেকেই বন্ধ হল। রান্নার লোক মিলির আদেশ অনুসারে রান্না করতো। প্রথম প্রথম সেই রান্না আমার বা মায়ের মুখে রুচতো না! কিন্তু অগত্যা খেতেই হতো। একেবারেই তেল মশলা ছাড়া রান্না খাওয়া অভ্যেস করতে আমাদের বেশ খানিকটা সময় লেগেছিলো। স্যুপ আর স্টুতেই আমার জীবনটা ঘুরপাক খেতে লাগলো।

মা ছিলেন যৌথ পরিবারের বড়ো বউ। বিয়ের পরেই অলিখিত ভাবে সংসারের প্রায় সব দায়িত্ব এসে বর্তায় মায়ের কাঁধে। মা হাসিমুখে সবটা সামলাতেন। আমার যখন বছর তেরো বয়েস, তখন মায়ের রান্নার কাজে সাহায্য করতে গ্রাম থেকে মামাবাবু নিয়ে আসেন রানু দিকে। রোগা ছিপছিপে একটা বছর কুড়ির মেয়ে। চোখ দুটো বেশ বড়ো বড়ো, সপ্রতিভ, অবাক দৃষ্টি, হাসিমুখ। সবসময় মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরতো, মাকে বড়দি বলে ডাকতো। মাকে রান্নায় সাহায্য করতো। একবার আমার খুব জ্বর হয়েছিলো, মনে আছে রানুদি অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে জলপট্টি দিচ্ছিলো। সারাদিন ব্যস্ত ক্লান্ত থাকা আমার মাকে এভাবে অনেক সাহায্য করতো রানুদি। মায়ের কাছেই রানুদির

রান্নায় হাতেখড়ি। কিছুদিনের মধ্যেই দারুণ রান্না শিখে গেলো, খুব আগ্রহ নিয়ে শিখতো প্রতিটি রান্না।

একদিন কাকিমার গলার সোনার হারটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না, স্নান করার সময় চৌবাচ্চার ধারে খুলে এসেছিলেন। তারপরেই রানুদি স্নানে গেছিলো। চুরির দায় এসে পড়লো রানুদির উপর। এ বাড়িতে রানুদির উপর মায়ের ভালোবাসা অনেকের কাছে আদিখ্যেতার সমান ছিলো। অনেক কান্নাকাটি করেছিলো রানুদি, তার থেকেও বেশি কেঁদেছিলো মা। কেউ বিশ্বাস করেনি সেদিন রানুদিকে। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। সেই রাতটা আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে ভোরবেলা বাবার সঙ্গে গ্রামে আমার মামারবাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো রানুদিকে। মা দু'দিন ভাতের দানাটুকু কাটে নি মুখে। বেশ কিছুদিন পরে অবশ্য হারটা পাওয়া গেছিলো চৌবাচ্চা পরিষ্কার করতে গিয়ে। ভরা চৌবাচ্চার এক কোনায় পড়ে গেছিলো হারটা, কারোর চোখে পড়ে নি। কিন্তু রানুদিকে আর পাওয়া যায় নি। হার পাওয়া যাওয়ার পরে মা বাবা আমার মামাবাড়ি গেছিলেন। কিন্তু রানুদির পরিবার অন্য কোথাও চলে গেছে জানতে পেরেছিলেন।

সকাল সকাল তৈরী হয়ে জলখাবার খেয়ে গোবিন্দকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম গন্তব্যে। তখন দোকান মোটামুটি ফাঁকা। মালিক ছেলেটি আমায় দেখেই এগিয়ে এলো।

স্নেহ

"আসুন স্যার, বসুন, আমি ননী দিকে ডেকে আনি। বলেছি ওনাকে আপনার কথা।"

কিছু পরে এক শীর্ণকায়া মহিলা সামনে এলেন। পরনে সাদা থান, কাঁচা পাকা চুল, মুখে বয়েসের ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু ওই চোখ দুটো দেখে মুহূর্তে চিনতে দেরি হল না রানুদিকে...

"চিনতে পারিস রানু দি?" বয়েসে বেশ খানিকটা বড়ো হলেও আমি রানুদিকে তুই করতাম... দৃষ্টি কমে এসেছে। চোখ ছোটো করে কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে রানুদি।

"বিলু, আমার বিলু... কেমন আছিস?"

"তুইই তাহলে এদের ননীদি... তোর হাতের রান্নার স্বাদ তোকে চিনিয়ে দিলো রে... কোথায় হারিয়ে গেছিলি রানুদি? কতো খুঁজেছি তোকে!" চোখের জল বাঁধ মানছে না আমাদের।

"বড়দি, বড়োবাবু কেমন আছেন বিলু?"

"বাবা চলে গেছেন বহুদিন হল রে... মাও চলে গেছেন প্রায় সাত বছর হয়ে গেলো। চল রানুদি আমার সাথে আমার বাড়ি চল, তোকে মাথায় করে রাখবো।"

"তা হয় না রে বিলু... এরা আমার বড়ো আপন, বহু বছর এদের সাথেই মিলেমিশে আছি, এরা যে বড়ো ভালোবাসে আমায়! ছেড়ে যেতে পারবো না কোথাও। তুই বরং মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাস।"

স্নেহ

"তোর তো বয়েস হয়েছে রানুদি... কষ্ট হয় না রান্না করতে?"

"ওরে বড়দি বলতো, রানু, এই রান্নাঘরেই আমাদের মোক্ষলাভ হয় রে, এখানেই আমাদের মুক্তি... রান্না করে সবাইকে খাওয়ানোর যে কী সুখ রে! আর নিজে হাতে কিছু করি না এখন, শুধু বড়দির শেখানো রান্নাগুলো এদের বলি, এরাই করে।"

হোটেলের রাঁধুনি, কর্মচারী সবাই কখন যে আমাদের ঘিরে আছে খেয়াল করিনি। মালিক ছেলেটি অবাক চোখে চেয়ে দেখছে আমাদের... গোবিন্দও অবাক!

"কি সুন্দর লাগছে রে তোকে বিলু... বিয়ে থা করেছিস? ক'টা ছেলে মেয়ে?"

"সবকিছু কি এখানে দাঁড়িয়েই শুনবি রানুদি? আজ চল আমার বাড়ি, কটা দিন থাক, প্রাণ খুলে তোর সাথে একটু কথা বলি!"

"নারে বিলু, আজ নয়, তবে অবশ্যই যাবো তোর সংসার দেখতে।"

মনে হাজারও প্রশ্ন নিয়ে সেদিন চলে এসেছিলাম বাড়িতে। রানুদি আমাদের বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পর কি হল? গ্রাম থেকে সপরিবারে চলে গেছিলো কেন? কলকাতায় কীভাবে পৌঁছালো? এই কাজ কতদিন ধরে করছে? রানু নামের বদলে ননী নামটি ব্যবহার করে কেন?

বাড়িতে কে কে আছে... অনেক প্রশ্ন... দোকানের মালিককে ফোন করে রানুদির বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে একদিন বিকেলের দিকে গোবিন্দকে সাথে নিয়ে চলে গেলাম রানুদির বাড়ি। বাড়িতে চারিদিকে দারিদ্রের ছাপ স্পষ্ট। তবু আপ্যায়নের ত্রুটি হল না এতটুকুও। একটি ছেলেকে দিয়ে কিছু আনালো। না করলেও শোনে নি। প্লেটে আমায় আর গোবিন্দকে সাজিয়ে মিষ্টি দিলো।

"আমি এখন মিষ্টি খাই না রানু দি... সুগার। আচ্ছা, একটা খাচ্ছি..."

"তবে থাক, দাঁড়া, আমি তোর জন্য চিনি ছাড়া চা আর তোর প্রিয় কালোজিরে শুকনোলঙ্কা দিয়ে মুড়ি ভেজে আনি..."

"কিচ্ছু করতে হবে না রানুদি... তুই আমার কাছে বস একটু।" গোবিন্দ ততক্ষণে মিষ্টি খেয়ে বাইরে চলে গেছে।

"আমি জানি বিলু তোর মনে অনেক প্রশ্ন... বড়োবাবু আমায় গ্রামে দিয়ে আসার পর কোনোভাবে গ্রামে রটে যায় যে চুরির দায়ে আমায় শহরে কাজের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে... লজ্জায় টিকতে পারলাম না গ্রামে। বাবা আমাকে আর মাকে নিয়ে চলে এলো কলকাতায়। এখানে একটা কারখানায় কাজ নিলো বাবা। মা দুই বাড়ি রান্নার কাজ করতো। এখানে থেকেই বিয়ে হল আমার। ভালোই ছিলাম, তোর জামাইদাদা খুব ভালোবাসতো

আমায়। ড্রাইভারি করতো। ছেলেপুলে হল না। আমায় ননী বলে ডাকতো তোর জামাইদাদা। ও মারা যাওয়ার পর আমি তিনটে বাড়িতে রান্নার কাজ নিলাম, পেট চালাতে হবে তো! তারপর এখন যাদের হোটেল তাদের বাড়িতেও রান্না করতাম। আমার রান্না খেয়ে বড়কর্তা আমায় নিস্তারিণী হোটেলে রান্নার কাজে বহাল করলেন। সেই থেকেই ওখানে কাজ করি। এখন বড়োকর্তা হোটেলে যেতে পারেন না, ছেলে বসে। বড়কর্তা ননীদি ডাকে, সবাই ওই নামেই ডাকে। রানু নামটা আমি নিজেই ভুলে গেছি রে। বড্ড ভালোবাসে আমায়। হোটেলের নাম বদলে দিদির হোটেল নাম রেখেছে... বলে ননীদি, তুমি না থাকলে আমার হোটেলের যে কী হাল হতো! তুমি আমার নিজের দিদির মতোই...”

হাঁ করে রানুদির কথা শুনছিলাম। আমার জিদ ধোপে টিকলো না... রানুদিকে কিছুতেই আমার কাছে নিয়ে গিয়ে রাখতে পারলাম না! আমার পরিবার যে অন্যায় রানুদির সাথে করেছে তার দায় এড়াবো কী করে? বললাম, “রানুদি আজ আমাদের জন্যই তোর এই অবস্থা... আমি তোর জন্য কিছু করতে চাই, চল আমার কাছে, আমার কাছে থাকবি। বাকি জীবনটা অন্তত একটু সুখে কাটা!” রাজি হল না রানুদি...

“ওরে পাগল, এখন খারাপ আছি নাকি? খুব ভালো আছি

রে... এরা আমায় যা টাকা দেয় একা মানুষ আমি, খুব ভালো চলে যায় আমার... তোর জামাইদাদা মারা যাওয়ার পর বড়কর্তা আমায় আগলে আগলে রেখেছেন রে! এদের ছেড়ে যেতে পারবো না রে বিলু।”

হোটেলের মালিক ছেলেটিকে অনুরোধ করেছিলাম আমি টাকা পয়সা দেবো, হোটেলটাকে আরো বড়ো করুক ওরা, আর রানুদিকে যেন মাসের টাকাটা বাড়িয়ে দেয়। ছেলেটি টাকা নিতে রাজি হয়নি। আর জানিয়েছে রানুদিকে টাকা বাড়ানোর কথা বলেছিলো, রানুদি বাড়তি কোনো টাকা নিতে রাজি হয়নি।

মিলিকে গল্পচ্ছলে রানুদির কথা বলেছিলাম। চোখে মুখে কোনো আগ্রহ দেখি নি... চোখ আর মনটা ছিলো মোবাইলে! একবার শুধু বলেছিলো কিছু টাকা দিয়ে সাহায্য করে দিও, গরীব মানুষ তো! আর কথা বাড়াইনি!

রানুদিকে একটা ফোন কিনে দিয়েছি, নিতে চায় নি... জোড়াজুড়িতে নিয়েছে আমার সাথে কথা বলার লোভটা শুধু ছাড়তে পারবেনা বলে।

মাঝে মাঝে গোবিন্দকে নিয়ে দিদির ভাতের হোটেলে যাই। হোটেলের মালিক ছেলেটির নাম তরুণ। তরুণও খুব খুশি হয় আমরা গেলে। যেদিন যাই তার আগের দিন রানুদিকে জানিয়ে যাই। সেদিন হোটেলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে রানুদি খাওয়ায় আমায় আর গোবিন্দকে। সে স্বাদ

অমৃততুল্য... মায়ের হাতের ছোঁয়া পাই সেখানে। সেদিনগুলো আমার খাবারে কোনো বাদ বিচার থাকে না। তৃপ্তি করে বহু পদ দিয়ে অনেকটা ভাত খাই। গোবিন্দ মানা করে। আমি অগ্রাহ্য করি। ধুর, ভালোবাসার কাছে প্রেসার, সুগার সব হার মানে...

রানুদির বাড়িতেও যাই। প্রাণ খুলে দুই ভাইবোনে গল্প করি। নির্লোভ আমার এই দিদিটার বাড়িতে যেদিন যেদিন আসি সেদিনগুলি আমায় ঘুমের ওষুধ খেতে হয় না। রানুদির মধ্যে আমি আমার মাকে খুঁজে পেয়েছি, রানুদিকে আর কোথাও হারিয়ে যেতে দেবো না। বড্ড ভালোবাসি আমি আমার এই অভাগা দিদিটাকে। ■

চিত্রাঙ্কন

ছবির নামঃ গ্রাম বাংলার দিনগুলি...

শিল্পীঃ রিত্বিকা চ্যাটার্জি ✧ বয়সঃ ১১ বছর

গান্ধারী

সমীর দাস

অন্ধ স্বামী, তাই তুমি, ঢেকে রাখ চক্ষে
বরনারী, হে গান্ধারী, কৌরব জননী
ঢাকা আঁখি, দেয় ঝাঁকি, বদ্ধ রাখা বক্ষে
পুত্রস্নেহে, অন্ধ হয়ে, বিচার ভোলোনি।

ভুলে স্নেহে, পুত্রত্যাগে, শত অনুরোধ
পাণ্ডবেরে অবিচারে, কর প্রতিবাদ
দাওনি আশিস পুত্রে, ন্যায় অবরোধ
যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ, ছিল আশীর্বাদ।

পুত্রশোকে অতি কোপে, দিয়েছিলে শাপ
ধ্বংস যদুবংশ, সেই অভিশাপে
হয় তাই, হয় নাই, সত্যের অপলাপ
রাজনীতি, কূটনীতি, সেই সব পাপে।

নও দেবী, হে মানবী, মহিষী গান্ধারী
ছিলে তুমি, ভাবি আমি, অসামান্য নারী। ■

হস্তাঙ্কন

ছবির নামঃ তথাগত...

শিল্পীঃ রূপসা পাল ✧ বয়সঃ ১৬ বছর

সবাই জানাবেন এই উদীয়মান শিল্পীর ছবিটি কেমন লাগল...

রাক্কুসীর মন*

সুভাষ মুখার্জী (নীলকণ্ঠ)

ও ডাক্তার কাকু এখানেও পাখি আছে, দেখে যাও... লাজুক মুখখানা অনিচ্ছাভরে ডেকেই ফেলে। বয়স তিন কি চার বছর। নেহাত সাধের বাছাদের দেখানোর ব্যাপার, না হলে সে হারগিস কথা কোইতো না। নাম সানিয়া খাতুন। গিয়ে দেখলাম ঝুড়ির মধ্যে খান পাঁচেক সদ্য ফোটা হাঁসের ছানা। সেই থেকে তার নাম হল "হাঁসের মা।"

কলবাজারের এই এলাকাতে কিছুদিন হল আসছি। বছর পঞ্চাশের আব্দুল ভাই "হেমি-পেরেসিস"এর রোগী। রোগ খুব একটা ঘোরতর নয়, তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন। কিছুদিন চিকিৎসা আর ব্যায়ামে তদারকির দরকার। মেয়ে রুকাইয়া-র ক্লাস থ্রী চলছে। তার একটা ককটেল আর বেশ কিছু বদ্রী পাখি আছে। তারও একটা নাম দিয়েছি; "পাখির মা।" সে পাখি অন্তঃপ্রাণ, সব সময় তাদের বুকে করে রাখে। স্কুলে গেলে পড়শি হাঁসের মা'কে সে নিজের বাচ্চা সামলাতে দিয়ে যায়। এতো আগলানোর কারণও অবশ্য একটা আছে। গত জন্মদিনে তার মামা দিয়ে গিয়েছিলো একজোড়া ককটেল; জ্যাক আর জিনি। বদ্রীপাখিগুলো তার কিছুদিন আগে এসেছে। মাস কয়েক আগেকার ঘটনা। এক

সকালে খাঁচাগুলো রোজকার মতো বাইরে রাখা ছিল। মাটিতে নয়, যেখানে রোদ আসে সে'রকম একটা দেওয়ালের হুকে ঝোলানো। পাখিদের মা স্কুলে গিয়েছে। এরই মধ্যে একটা বেড়াল উঠে বসেছে একেবারে ককটেলদের খাঁচার উপর! বেড়ালটা এই বাড়িতে ঘোরাফেরা করে। নতুন আসা খাবারে তার লোভ জেগেছে! পাখিরা তখন অনেক ছোটো। তাও যথাসম্ভব চেষ্টা করেছিলো চেঁচিয়ে মা'কে ডাকতে। ওদিকে নুলো মেরে মেরে রাক্কুসী (ঘটনার ভয়ঙ্করতায় এই নাম দেওয়া হয়েছে) খাঁচার দরজা খুলে ফেলেছে। জ্যাক ছেলে, দেখতে একটু বড়োসড়ো রংবাহারী। তাকে কামড়ে বার করে নেয় রাক্কুসী। প্রাণ বাঁচাতে জিনি উড়ে পালিয়েছিলো পাশের পাঁচিলে।

ততক্ষণে লোকজন এসে পড়েছে। ইঁট মেরে রুকাইয়ার মা রাক্কুসীর মুখ থেকে ছাড়িয়েছিলেন জ্যাক'কে। ডানায় দাঁতের বড়ো বড়ো ফুটো; চলে সুশ্রসা। ধরে আনতে গেলে জিনি উড়ে যায় খোলা আকাশে, বরাবরের জন্য। পাখিদের মা ফিরে তো কেঁদে অস্থির। এখনও সে'সব বলতে বলতে ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠেছে মেয়েটার। জ্যাক নাকি তারপর থেকে কালো মুরগী দেখলেও ভয় পায়। এত আতঙ্ক! আর সে আসলে তো তারস্বরে চেঁচায় রাক্কুসী রাক্কুসী বলে।

লকডাউনে স্কুল বন্ধ। আব্বুকে হাঁটাতে নিয়ে বার হলে মেয়েও সাথে বার হয়। হলদে-সাদা-কালোয় বেড়ালটাকে দেখালো একদিন। চোখ দুটো সত্যিই রাক্ষসী! রুকাইয়ার মনে

জিনির জন্য এখনও দুঃখ। সেটা থাকলে জ্যাক খুব খুশি থাকতো। খাঁচায় বেঁধে দেওয়া মায়ের খেলনা নিয়ে একা একা খেলতে হতো না। বৌদি বলছিলেন “সবই বুঝি ডাক্তারবাবু। মেয়েটার খুব ইচ্ছা আরেকটা ককটেলের। কিন্তু এতো দামী পাখি কেনবার সৌখিনতা আল্লা আমাদের দেন নি। এত খরচ করবার জন্য আমি ভাইকেও বকেছিলাম। দেখুন না এমনিতেই নসিবের ফেরে একটা ঘরে টেপা-গোঁজা হয়ে রয়েছি। রিফিউজিদের মতো দিন কাটাচ্ছি। গাছে উঠে এখন মই বেপাত্তা। নিজে ঘর করবার তো আর সামর্থ্য নেই।” বিষয়টা সত্যি দুর্ভাগ্যজনক। টালির চাল হলেও এনাদের দুটি ঘর ছিলো। সরকারি স্কিমের পয়সায় নতুন ভালো ঘর হবে এই আশ্বাসে একটি ঘর ভাঙা হয়েছে। বাকি একখানি ঘরই এখন ভরসা। এর ঠিক পরেই লকডাউনে সব বন্ধ। এখন দপ্তর খুললেও কাজে এলা পড়েছে, টাকা আর আসছে না। যারা সাহস দিয়েছিলেন, তাঁরা দায় এড়াচ্ছেন। স্বল্পভাষী আব্দুল ভাই কাজ ছেড়ে ও'দিকে বেশি দৌড়াতেও পারছিলেন না। এরই মধ্যে আবার এই রোগ বিপত্তি। কথা ঘোরাতে রুকাইয়াকে বললাম, "মেয়েটার নাম জিনি কে দিতে বলেছিলো তোকে? গেল তো বোতল থেকে পালিয়ে!”

গল্পে একটি টুইস্ট-ও আছে। এই রাক্কুসী কিন্তু রুকাইয়ার কাছে রোজ ভাত পায়! এমনকি মাছ, ডিম খেলে তার জন্য ভাগ রাখা হয়। আসলে পাখির মা হলেও তার তো মায়েরই মন। এতদিন ধরে বেড়ালটাকে খাইয়ে আসছে। সে'দিন

লোভে পড়ে অমন করে ফেলেছে বলে তাকে কি তাড়িয়ে দেওয়া যায়! পাড়াশুদ্ধ সবাইকে অবাক করে দিয়ে এখন দু'পক্ষকেই লালন পালন করে চলেছে সে। আরেকটা সুযোগ দিয়েছে রাক্কুসীকে। অবশ্য সাবধান করেছে অনেকেই, “সুযোগ পেলেই বেড়াল ফের নিজমুর্তি দেখাবে। তখন বুঝবি ঠ্যালা!” পাখির মা নাছোড়-বান্দা। মন ভালো থাকলে রাক্কুসীকে যেমন আদর করে তেমনই সতর্কতায় ঢিলে পড়ে না এতটুকু। রাতে শোবার আগে দেখে নেয় ঘরে কোথাও বেড়াল ঢুকে লুকিয়ে নেই তো?

ক'দিন বাদে গিয়ে দেখি হুলুস্থুল কান্ড। পাখির মা বাড়ি নেই। বৌদি ফোনে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। শেষে আব্বুর মুখে খারাপ খবরখানা জানতে পারলাম। মেয়ের সকাল থেকে হঠাৎ পেটের যন্ত্রণা। কিছুতেই কমে না তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। তিনদিন নাকি তার 'পটি' হয় নি। সে'কথা গোপন রেখেছিলো এতক্ষণ। শেষে হসপিটালে ভর্তি করতে হয়েছে। ওর মা সাথে থাকতে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। দেখে এলাম পাখিরাও যেন কেমন মনমরা হয়ে রয়েছে। পরদিন ফের একখানা খারাপ খবর। পাখির মায়ের কিডনিতে পাথর দেখা গিয়েছে। মেয়েটা মাছ, ডিম ছাড়া ভাতই খায় না। পাড়ায় সবা'র মধ্যে সদ্ভাব আছে, কেউ-না-কেউ রোজ ওর জন্য ঠিক দিয়ে যায়। উপরন্তু সে জলও খায় নামমাত্র, তাই এই বিপত্তি। তবে স্বস্তির কথা পাথরের আকার খুবই ছোট, কিছুদিন ওষুধ খেলেই গলে যাবে।

তৃতীয় দিন গিয়ে দেখি মেয়েটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। এমনিতেই রোগা, আজ যেন পাঁজর দেখা যাচ্ছে। যদিও মুখের মিষ্টি হাসিটি কিন্তু রয়েছে একই রকম। হসপিটালে ছিল। আজ ছুটি পেয়ে মায়ের সাথে বাড়ি ফিরেছে। কিন্তু অবাক করেছে তার ছানাপোনাদের আচরণ। পাখিরা এই দু'দিন জল ছাড়া কিছু খায় নি! যদিও এমনিতে তারা অন্যের হাতে দিব্যি দানা খায়। এ'বার কিভাবে যেন বুঝে ফেলেছিল মা বাড়িতে নেই। সবচেয়ে আশ্চর্য কান্ড করেছে রাক্কুসী। সে আরও তিন-চার বাড়ি খেতে যায়। এই দু'দিন তাকেও কেউ কিছু খেতে দেখেনি। ডেকে খাবার দিলেও মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়েছে। হাঁসের মা তো বলছে রুকাইয়ার জন্য ও'র মন খারাপ ছিল।

রাক্কুসীর মন থাকে কি? কে জানে? নিজের আগামী মাসতিনেক শাকসবজি আর সিদ্ধ ভাত ছাড়া সবকিছু খাওয়া বারণ। কিন্তু পাখির মা ফিরেই যত্ন করে আগে বেড়াল আর পাখিদের খাওয়াতে বসেছে। দেখে এলাম তিন পক্ষের সবা'র মুখেই স্পষ্ট স্বস্তির ছাপ। ...যাই হোক। শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। ■

*(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা গল্পটির স্থান ও চরিত্রদের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে।)
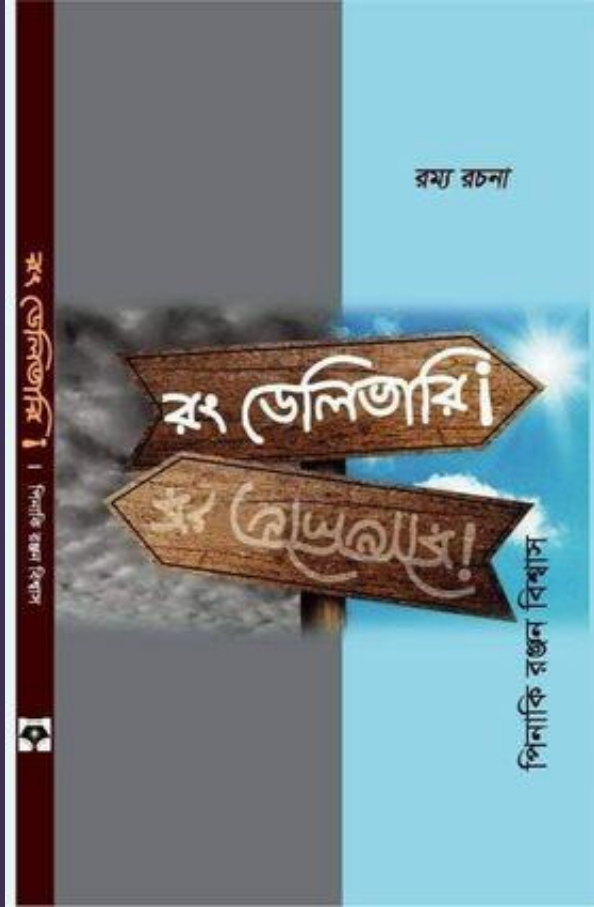
নারী দিবস

সামিমা খাতুন

কি হবে লেডিস স্পেশালে!
কাজ কি নারীর দিনে?
রাখো যদি তাকে পদতলে,
তার অনুভূতিগুলো কিনে।

বোঝানো চলে প্রতি পলে,
জন্মেছো মেয়ে হয়ে,
চলো সমাজ যেমন বলে,
কাটাও জীবন ভয়ে।

মেয়েদের স্বপ্ন দেখা মানা,
ইচ্ছারা মনেই থাক না,
প্রয়োজন নেই পড়াশোনা,
উড়তে চাইলে কাটো ডানা।

নিজের বোনকে রেখে দমিয়ে,
মাকে করে অপমান,
সমাজ-মাধ্যমে কথা সাজিয়ে,
নিজেকে প্রমাণ করো মহান।

নিষ্পাপ কন্যা ভ্রূণ হত্যা করে,

সন্মান

বাড়ির বৌকে বেড়ি পরাও,
নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়ে,
মুগ্ধ ভক্তের সংখ্যা বাড়াও।

সাক্ষী হয় প্রতি দিন প্রতি রাত,
নারীর উপর চলা শত অপরাধ,
নিষ্ঠুর কিছু শয়তানি হাত,
কাড়ে কারো বাঁচার সাধ।

তবুও আশা থাকে মনের কোণে,
নারীর হাতেই থাকবে তার রাশ,
কোনো এক কাল্পনিক দিনে,
হবে সেদিন আসল নারীদিবস। ■

মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়

সুমন চক্রবর্ত্তী (বাংলাদেশ)

(শৈশবে বস্তিতে দেখা এক নির্বাক ঘটনার ছায়া অবলম্বনে)

আলেয়া নামের মেয়েটি খুবই চঞ্চল। একে ঠিক চঞ্চলতা বা অস্থিরতা বললে ভুল হবে। মা-বাবা না থাকলে অনেকটা পেটের দায়ে যেভাবে চলতে হয়। স্কুল শেষ হবার আগেই যার মা-বাবা দুনিয়া ছাড়ে, তার চলন-বলনতো এমনি হবে। আত্মীয়-স্বজনেরা পয়সার লোভে আলেয়াকে ভিটেছাড়া করে চাকুরি দেওয়ার নাম করে একটি পতিতালয়ে বিক্রি করে দেয়। মা-বাবার এক সন্তান, তাও আবার মেয়ে। তাই অবস্থার ঘুর্ণিপাকটা এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। এতো কঠিন পরিস্থিতি যে আলেয়াকে অতিক্রম করতে হবে; তা কখনো ভাবেনি আলেয়া। সমাজের আপন মানুষগুলোর আগ বাড়িয়ে কথা বলার রহস্যটা এখন তিলেতিলে উপলব্ধি করে আলেয়া। কারনে-অকারণে কথার ক্ষত সৃষ্টি করে আবার সবার সামনে প্রাণ দিয়ে দেওয়ার মিথ্যে বাহানাগুলো দেখে আলেয়ার মা-বাবার মমতার কথা মনে পড়ে যায়। সে ছোট থেকেই আদর কি জিনিস জানে না? যেটা দেখেছে সেটা সবাইকে খুব সহজে মুখে বলা যায় না। অনেক সময় দিন

অবিচার

নেই রাত নেই, তার ঘরের দরজায় টোকা পড়ে। মোবাইল ফোন বাজতে থাকে। শরীরটা যেন ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। সেই আগেকার মতো আর কোন সাড়া নেই। আলেয়া এখন ভাবতে থাকে শরীরের আবেদন শেষ হয়ে গেলে কেউ আর কাছে আসবে না। কিভাবে জীবন চলবে? দু'বেলা খাওয়াতো দূরের কথা, দুটো পয়সাও কেউ দেবে না। অনেকে আদিম নেশায় বেশি টাকা দিয়ে যে সিগারেটের ক্ষত ও কঠিন আঘাত করে, তা বোঝানোর বোধ্যতা আলেয়ার নেই।

সমাজের ভালো মানুষের বেশ ধরা শয়তানগুলোই আলেয়ার কাছে যে পরম আরোগ্য। না আসলে যে খাবার জোটে না। আলেয়া নিজের মানবিক সীমারেখায় ভাবে – প্রত্যেক ভালো মানুষরূপী শয়তানকে কাউকে না কাউকে বরন করে নিতে হয় সারাজীবনের জন্য। সে কিভাবে থাকে? তার ভাবনা কেমন? এসব প্রশ্ন করতে করতে হঠাৎ তার শরীরে কিল ঘুষি চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই সব শান্ত। কতো মহামানব আলেয়ার কাছে এসেছে, তা সে জানে না। কিন্তু সমাজে গেলেই তাদের স্বনামধন্য পরিচয় পাওয়া যায়। তার মাঝে আত্মীয়-স্বজনেরা ছদ্মবেশে বা বিনা পরিচয়ের খদ্দের পাঠায়। আলেয়ার মান-সম্মান বলতে শরীরটা নিয়ে কোনোভাবে বেঁচে থাকা। সে এখন পঁচিশে পা দিলো। এখনই সে একরকম ঝিমিয়ে পড়েছে। তাই সে নিজেকে তার আগামীর পথ পাড়ি দিতে একজন চিরায়িত

অপেক্ষমান মানবের হাতে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করতে চায়। সমাজের অন্য আট দশটা মেয়ের মতো বিবাহ নামক বেষ্টনীতে আবদ্ধ হয়ে, সে জীবনের বাকী সময়টা কাটাতে চায়। এতে সুখ আসবে নাকি যৌবনের এই পড়ন্ত বেলায় আরো অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে – সেসব তার হিসেব-নিকেশের বাইরে চলে গেছে।

অন্ধকারের নিয়ন আলোতে সূর্যের রোদ উঠলেও যে কলঙ্কের দাগ লেগে থাকে, তা সে ভালো করেই জানে। অবশেষে চল্লিশ বছর বয়সী রিকশাচালক সিদ্দিক আলেয়াকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে ঘরে তোলে। কিন্তু তাকে থাকতে দেয় ভিটের বাইরে একটি আস্তাকুঁড়ে। অনেকটা সারাদিনের অবসরে চিরস্থায়ী শয্যাসঙ্গীনি। ঘরের সমস্ত কাজ করতে সিদ্দিক কাজের মেয়ের মতো ব্যবহার করে আলেয়াকে। স্বামীর পরিচয়ে দিন-দুপুরে, রাত-বিরাতে চলে অমানবিক অত্যাচার। কুলটা নারীর মতো তার জীবন আরো সভ্য পরিচয়ে কলঙ্কিত হতে থাকে। এই অত্যাচারের মাঝে আলেয়ার কোলে জন্ম নেয় ছোট্ট আক্কাস। আক্কাস জন্ম নেওয়ার পর একদিনের জন্যেও রেহাই দেয় নি সিদ্দি। প্রতিনিয়ত আলেয়াকে নিষ্পেষিত করেছে সিদ্দিক। আক্কাস অল্প বয়সে শুধু অপলক দৃষ্টিতে দেখতে থাকে। বুঝতে পারে না বাবা-মায়ের এসব হিসেব-নিকেশ। মায়ের বুকে মুখ দিতে গেলেই দেখে থকথকে রক্ত।

অবিচার

আক্কাস ভয়ে কাঁদে। আলেয়া সন্তানকে সীমাহীন আবেগে জড়িয়ে রাখে। একদিন আক্কাসের ভীষণ জ্বর। আলেয়া সিদ্দিককে ছেলের জন্য ডাক্তার ডাকতে বলে। সিদ্দিক তখন এসেছে শুধুমাত্র আলেয়ার চিরপরিচিত সঙ্গমের মোহনায়। সে আলেয়ার কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় আক্কাসকে। আক্কাস গিয়ে পড়ে ঘরের কোনে পড়ে থাকা ধারালো বঁটিতে সিদ্দিক আদিম উচ্ছ্বাসে মেতে উঠে। আলেয়া তখন বিবস্ত্র শরীরে তার আজীবনের প্রাপ্য সন্তানের কাছে যেতে চায়। কিন্তু সিদ্দিকের কঠিন হিংস্রতা তাকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে। আলেয়া তখন দেখে তার প্রিয় সন্তানের কাঁধ থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেছে। বঁটি রক্তে লাল হয়ে গেছে। মা-বাবা ভুল করলে তার দায়ভার সন্তানকেও যে বয়ে বেড়াতে হয়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ আক্কাস।

সিদ্দিকের সন্তানের মৃত্যুতে কোনো খেয়াল নেই। কেমন জন্মদাতা সে? সন্তানের মৃত্যুতেও আড়ষ্ট নয়। যখন পুরো শরীর শারীরিক উত্তেজনার অন্তিম অভিলাশে নিস্তেজ হয়ে পড়লো; তখন সন্তানের রক্তমাখা বঁটি দিয়ে নরপিশাচরূপী স্বামীকে সন্তান হত্যার দায়ে এলোপাতাড়ি কোঁপাতে থাকে আলেয়া। কিছুক্ষণের মধ্যেই আক্কাসের মতো সিদ্দিকও রক্তাক্ত শরীরে ঢলে পড়ে, পুরো ঘর তখন রক্তে রঞ্জিত। আলেয়ার মুখে শুধু একটি কথা-আর কি দেখার আছে, খোদা?

অবিচার

সন্তানের রক্তে কামনার জ্বালা মিটায় পিতা। হা হা হা অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে আলেয়া। আর নিজের শরীরে জেগে থাকা সন্তানের জন্মস্থানকে স্বামী হত্যার নির্দশন দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে থাকে। বুকের দুই মাতৃচিহ্নকে চিরতরে মুছে ফেলতে অস্বাভাবিক আঘাত করে আলেয়া। এটা তার আত্মহনন নয়, পৃথিবীতে কোন মায়ের সামনে সন্তানের রক্তমাখা মৃতদেহও কঠিন প্রশ্নবোধক চিহ্ন তৈরি করে মায়ের শরীরে থাকা পবিত্র জন্মস্থানের অন্তঃপুরে। আলেয়ার বাকরুদ্ধ হয়ে আসে। সন্তান ও স্বামীর মৃতদেহের পাশে সেও ঢলে পড়ে।

শুয়ে শুয়ে সে ভাবতে থাকে পৃথিবীতে নারীদের সুখটা আসলে শুধুই লোক-দেখানো। যেখানে জন্মের সীমারেখায় থাকে কামনার দাগ, সেখানে প্রজন্মের বেড়ে ওঠা নয়- বেঁচে থাকাটাই বিস্ময়কর! চিরন্তন পরিচয়ও যেন সেইদিনের খদ্দেরের মতো অন্ধকারই নিয়ে আসে! পার্থক্য এই যে, শুধু সময় আর মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়। যেখানে ভদ্রতা বেমানান, শুধু কসাই-এর মতো দর-পতন হিসাব।

আলেয়া ভাবতে থাকে পৃথিবীর সব মেয়েরাই এমন হঠাৎ ভালো লাগা পরিচয়ের দামে কোন তথাকথিতের কাছে নিজেকে সম্ভ্রমসহ পুরোদমে বির্সজন দেয়। যেখানে নিজের বলে আর কিছুই থাকে না। ভালোবাসা মানেই সেখানে জেগে উঠে চিরচেনা প্রাত্যহিক অনির্বাচিত কামনা, হয়তো

অবিচার

কয়েকটি সন্তান উৎপাদনে যার পরিসমাপ্তি হয় না!

পুলিশ আসে হাতকড়া লাগাতে। তখন আলেয়া চিৎকার করে ওঠে - স্যার, একটু সময় দিন। শরীরটার চিরতরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে চলেছে, যেখানে দেখবো না চোখ জুড়ে কোন সংকোচহীন কামনার দাগ। হাতকড়া পড়ার আগেই চিরনিদ্রায় শায়িত হওয়ার নিদারুণ প্রস্তুতি আচ্ছন্ন করে আলেয়াকে। উৎপাদন যন্ত্র ক্রিয়াহীন হলে চোখের প্রতিক্রিয়া যে চিরতরে হারিয়ে যায় তা আলেয়ার বুঝতে বাকি থাকে না। হয়তো এমন অন্ধকারে কারো নির্লজ্জ চোখ আর কখনো অপেক্ষা করবে না কোন মুহূর্তে!

সন্তান আক্কাসের কোমল হাত স্পর্শ করতে করতে চিরনিদ্রায় শায়িত হয় আলেয়া। যেখানে থাকে না কোন নির্ঘুম রাত, আক্কাসের পবিত্র হৃদয়ের শিহরণে এক জীবন্ত মমিতে পরিণত হলো আজীবনের অভিশপ্ত আলেয়া। যেন মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়ের আগেই সব পরিসমাপ্তির চির অবসান ঘটে। সূর্যের আলোয় এই অন্ধকার আর কোনদিন আলোকিত হবে না। ■

শিলা তোর মনে পড়ে?

রাকিবুজ্জামান শাদ (কাঙাল শাদ, বাংলাদেশ)

শিলা তোর মনে পড়ে?
বসন্তের সকালে বসে দুজনে শিমুল গাছের পাশে কবিতা পড়তাম।
তোর পছন্দ পদ্য কবিতা আর আমার গদ্য,
এই নিয়ে কতো কথা কাটাকাটি যেন সাকরাইন ঘুড়ি উৎসবে প্রতিযোগিতায় দুজন ব্যস্ত।
অবশেষে যথারীতি তুই করলি হুকুম জারি, পদ্য পড়েই করতে হলো বেলা পাড়।
দুপুরে ঘরে ফিরে খাওয়া নাই হতে হাজির,
বললি আম কাননে মুকুল দেখতে যাবি আর আমি যেন সুটকেস বেঁধে সাথে নি।
মায়ের বকা খেয়ে দুর্নাম কাঁধে,
ভর দুপুরে চললাম অচেনা পথে।
নিয়ে গেলি এক সুন্দর বাগানে,
মুকুলের ঘ্রাণে উন্মাদ দুজনে,
ছুটোছুটি করে ক্লান্তিতে,
অবসন্ন হৃদয় শুয়ে পড়লাম তোর কোলে মাথা রেখে।
ঘুম ভাঙতেই দেখি সন্ধ্যা,

প্রেম

তোকে ডেকে তুলে বললাম ভয়ার্ত কণ্ঠে,
“ওঠ ওঠ সন্ধ্যা হয়েছে!
ঐ দেখ বাদুড়ের দল ফিরছে নীড়ে,
আমাদেরও তো যেতে হবে ঘরে।
এই সন্ধ্যায় বাইরে জানলে হাত-পা ভাঙবে মেরে!”
অবশেষে আশঙ্কা সত্য হলো,
বাড়ী ফিরে মার খেয়ে ব্যথা সর্বাঙ্গ।
রাতে তোর কথা স্মরণে অস্থির মনে ছুটলাম তোর বাড়ী।
জোছনার রাতে গল্প করতে উঠলাম ছাদে,
ছোট-বড় শতসহস্র তারা গুনতে গুনতে হঠাৎ বললি,”যদি মরে তারা হই,আমার সঙ্গী হবি?”
না ভেবেই বললাম নিশ্চয়ই... ■

‘গুঞ্জন’এর পরবর্তী সংখ্যাগুলির বিষয়বস্তু

এপ্রিল – বাংলা নববর্ষ সংখ্যা

মে – শ্রমিক দিবস সংখ্যা

জুন – বর্ষা বরণ সংখ্যা

জুলাই – রহস্য রোমাঞ্চ ও কল্প কাহিনী সংখ্যা

অগাস্ট – মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংখ্যা

সেপ্টেম্বর – পুরানো দিনের কথা সংখ্যা

উত্তর পুরুষ

নন্দিতা চৌধুরী

দিনও হতে ভোর
খোলে ডোর
পথে নামে!

কোলে ছাবাল
বয়েসে নাবাল,
মা, চলে, থামে!

জোটে না ভিক্ষা
কাজের প্রতীক্ষা
ফেরে সে দ্বারে দ্বারে,
শিশু সহ মা
দু'টি জঞ্জাল,
কেউ তোলে না ঘরে!

দুধের বেলায়,
ক্ষুধার জ্বালায়,
সন্তান অস্থির,
অভাগী মায়ের
হৃদয় খানি
ভেঙ্গে হয় চৌচির!

বাঁধন

বন্ধ্যা স্তন গ্লানিতে আনে
মাতৃত্বের পরাজয়,
মূল্যবোধের বিসর্জন
করে মা নিশ্চয়!

বিবেকের শেষ কৃত্য সারে,
আত্মায় তাড়াতাড়ি,
ঠিকানা দিয়েছিল,
ঠিকাদার এক,
বেপরোয়া চলে সে বাড়ি!

জটিল দুনিয়ার চক্রব্যূহে নারী,
মমতা পরালো ফাঁস,
শিশুর প্রাণের তাগিদে বাঁচে,
হয়ে সে জ্যান্ত লাশ!

ফুটোনো দুধ,
আহার রকমারি,
সন্তানের তৃপ্ত হাসি,
কতো অনায়াসে
পরিস্থিতি পরালো,
মায়ের গলায় ফাঁসি!

অন্ন-বস্ত্র, আহার বিনিময়ে,
আদর্শের হনন,

বাঁধন

দর কষাকষিতে
মূল্য দাঁড়ায়,
সতীত্বের দহন!

অসতী নামে সে আখ্যাত সমাজে,
সেই থেকে পরিচিত,
প্রতিবাদ করেছে
ছেলেটি তার,
কিশোর বয়সে কতো,
"আমার মা তা নন্"
করেনি কর্ণপাত কেউ,
কতো বড় প্রহসন!

কাল বয়ে যায়,
বয়ে যায় দিন জীবনের,
আশ্রয় না, হয় হাতছাড়া
উত্তর পুরুষের!

মা থাকে চুপ,
দ্যাখে দুনিয়ার রূপ! ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০১৯

http://online.fliphtml5.com/osgiu/genc/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/zczy/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btzm/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/fyxj/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/tebb/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/ddla/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/btss/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০১৯ এ প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক পুনরায় দেওয়া হল।**

ভুল

রিয়া মিত্র

মঞ্চে মেয়ের বক্তৃতা শুনে কমলেন্দু বাবুর চোখে জল চলে এলো। ছোট থেকেই মেয়েটা বড় লিখতে ভালোবাসত। একদম ওর মায়ের মতো লেখার প্রতি ভালোবাসা ছিল মেয়েটার।

কমলেন্দু বাবুর স্ত্রী অনিতা দেবীও লেখালেখি, সাহিত্য-চর্চা করতে খুব ভালোবাসতেন। যেদিন অনিতা দেবীর এই সখের কথা কমলেন্দু বাবুর মা আর দুই দিদির কানে যায়, কি অশান্তিটাই না তাঁরা করেছিলেন! অনিতা দেবীর লেখার সাধের লাল ডায়রিটা তাঁরা আগুনেই পুড়িয়ে দিলেন। মেয়েমানুষের আবার পড়াশোনা, লেখালেখি কীসের? যতসব আদিখ্যেতা, সংসারের কাজ না করে পটের বিবি সেজে বসে থাকার ফন্দি। সংসারের যাবতীয় কাজ চাপিয়ে দিতে লাগলেন অনিতা দেবীর ওপর, যাতে দিনের শেষে ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরে তাঁর সাহিত্য-চর্চার ভূত ঘাড় থেকে নেমে যায়। তবু অনিতা দেবী দিনান্তে গোপনে তাঁর প্রাণের ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন। এই জন্য স্বামীর কাছেও কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি তাঁকে। সেদিন মাতৃভক্ত কমলেন্দু বাবুও বৌকে অপমান করতে ছাড়েননি। বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল তাঁর...

সংশোধন

অন্নপ্রাশনে মেয়ে যখন সব কিছু ছেড়ে বই আর পেন তুলে নিল, অনিতা দেবীর বোধহয় বুক কেঁপে উঠেছিল! তাঁর মতোই মেয়েরও পরিণতি হবে না তো?! এরপর সব চোখরাঙানি অগ্রাহ্য করে মেয়ের লেখালেখি আপন ছন্দে এগিয়ে গেছে। অনিতা দেবী নিজের অপূর্ণ সাধ পূর্ণ করতেন মেয়ের হাত ধরে। লুকিয়ে মেয়েকে লেখালেখিতে উৎসাহ দিতেন। প্রাণাধিক প্রিয় মেয়েকে কোনো কিছুতেই বাঁধা দেননি কমলেন্দুবাবু। নিজের স্ত্রীকেও যদি এই স্বাধীনতা দিতে পারতেন, হয়তো আরেকটি কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটতে পারত! অনুতপ্ত কমলেন্দুবাবুর আফসোসে মনটা ভরে উঠলো। আজ অনিতা দেবী বেঁচে থাকলে মেয়ের সাফল্যে খুব খুশি হতেন, তাঁর অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ হতো।

মঞ্চে তখন 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রাপ্ত স্বর্ণালী দেবী ডেকে নিয়েছেন তাঁর বাবাকে, "যে মানুষটা না থাকলে লেখার অনুপ্রেরণা পেতামনা, তিনি আমার বাবা, তাঁকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করছি।" ঝাপসা চোখে মঞ্চে উঠে এলেন কমলেন্দুবাবু। স্বর্ণালী দেবী বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বললেন, "ভাগ্যিস্, মায়ের মতো বিদুষী নারীর চলার পথে তোমরা এত বাঁধা দিয়েছিলে, তাই তো আমার জেদটা দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। মা কিন্তু বীরাঙ্গনার মতো আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছিল, কখনো আমাকে হেরে যেতে দেয়নি।" অনুকম্পিত, লজ্জিত কমলেন্দুবাবু মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে নিজের ভুল সংশোধন করলেন। ■

প্রকাশিত সংখ্যা - ২০২০

http://online.fliphtml5.com/osgiu/kjbd/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/hljw/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/lmjq/

http://online.fliphtml5.com/osgiu/dadg/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lgaq/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/tefw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/eitj/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/vsgw/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/lpsr/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/xnih/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/buzn/

https://online.fliphtml5.com/osgiu/mjwo/

পাঠকদের সুবিধার্থে নিঃশুল্ক বাংলা অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা **'গুঞ্জন'এর ২০২০ তে প্রকাশিত সব সংখ্যাগুলির ই-লিঙ্ক এখানে দেওয়া হল।**

PREVENTION OF COVID - 19
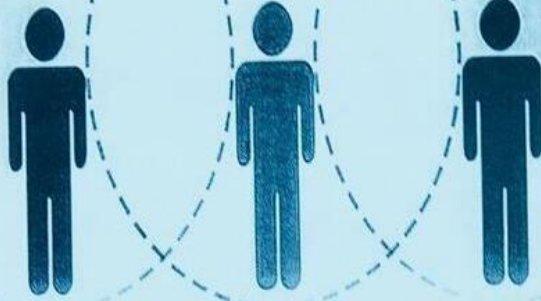
SOCIAL DISTANCING

Photo by Ekaterina Belinskaya from Pexels

PREVENTION OF COVID - 19
Photo by Anna Shvets from Pexels